বাতায়ন

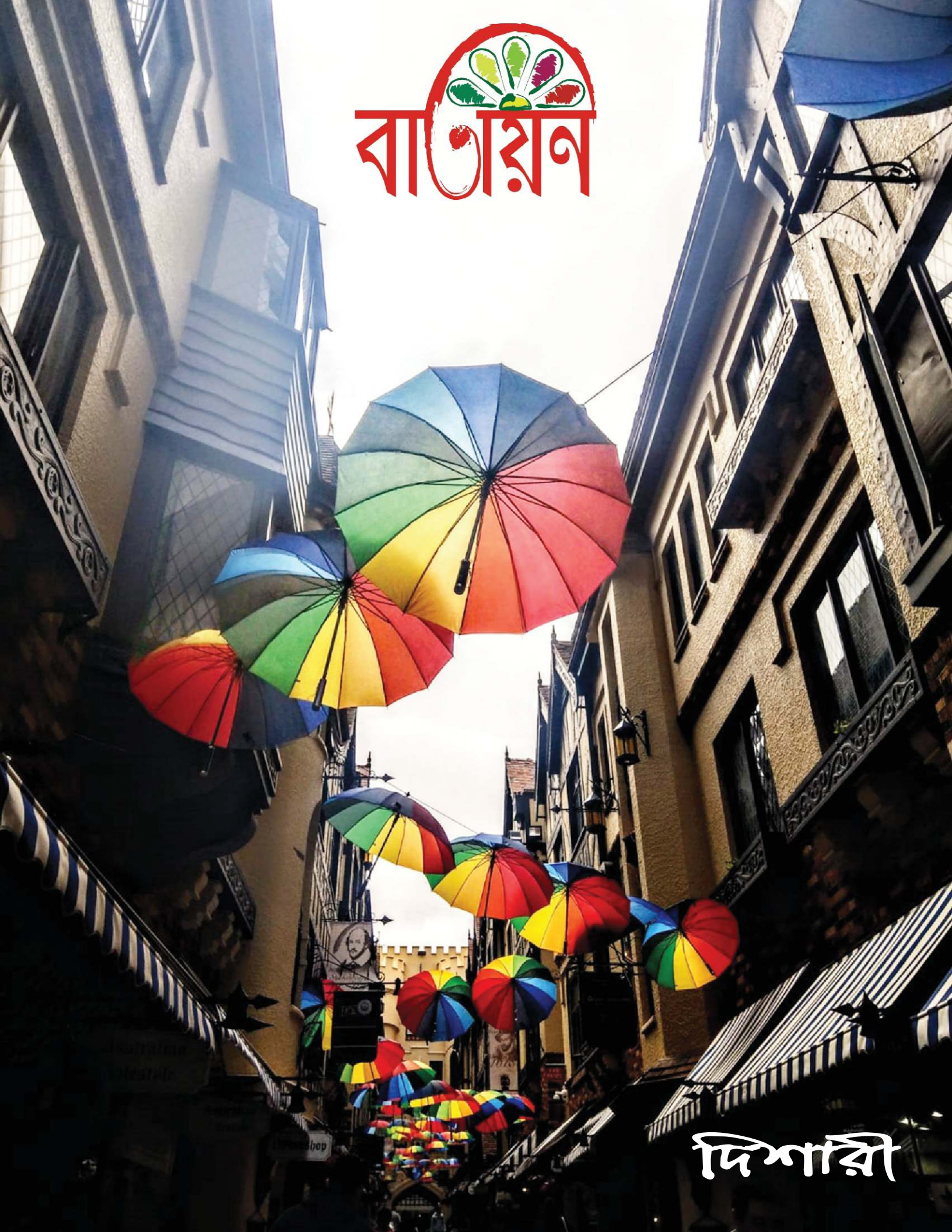

দিশারী

বাতায়ন

Batayan

ঊনবিংশ সংখ্যা

ডিসেম্বর, ২০১৯

সম্পাদনা

রঞ্জিতা চট্টোপাধ্যায়

বাতায়ন

Issue Number 19 : December, 2019

Editors

Ranjita Chattopadhyay, IL, USA
Jill Charles, IL, USA (English Section)

Coordinator

Manas Ghosh, Kolkata, India
Snehasis Bhattacharjee, Kolkata, India

Networking & Communication

Biswajit Matilal, Kolkata, India

Design & Art Layout

Kajal & Subrata, Kolkata, India

Website Support

Susanta Nandi, India

Published By

BATAYAN INCORPORATED
Western Australia
Registered No. : A1022301D
E-mail: info@batayan.org
www.batayan.org

Chief Editor & CEO

Anusri Banerjee
Perth, Western Australia
a_banerjee@iinet.net.au

Photo Credit

Aheli Guha — **London Court in the Perth city centre : Front Cover**

Aheli studied law at the University of Western Australia. She is currently working for the Australian Federal Government. She has travelled to many countries and picked up a love for photography on the way. Her other passion is music. She plays the violin and viola, directs and arranges music for the Anandadhara WA Youth Ensemble.

Saumen Chattopadhyay — **Partly Frozen Lake : Front Inside Cover**

Saumen is an avid outdoor enthusiast and enjoys hiking, trekking, and photography. He also takes part in recitation, drama, mind science, Native American flute and Indian classical music. Saumen is an entrepreneur in the field of investment research and portfolio management. He lives in Chicago.

তনিমা বসু — **Fall colors in Michigan : Title Page**

তনিমা পদার্থ বিদ্যায় স্নাতক । ইউনিভার্সিটি অফ মিশিগানের বায়োস্ট্যাটিস্টিক্সে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী সুযোগ করে দিয়েছে সংখ্যাতত্ত্ব ব্যবহার করে অন্তর্হিত সত্য উদ্ঘাটন করার । বিজ্ঞানের ছাত্রীর অবসর সময় কাটে কাগজে আকিঁবুকি করে, বিভিন্ন মিডিয়ামের সাথে পরিচিত হয়ে – কখনো কাগজে, কখনো স্ক্রিনে । ভালোবাসে ছবি তুলতে রঙীন প্রকৃতির এবং আপনজনদের ।

Krishnakoli Bose Banerjia — **St. Kilda – Sun set : Back Cover**

Krishnakoli Bose Banerjea – মেলবর্ন বাসিন্দা... মনে প্রাণে Calcacian. পেশায় Cloud Solution Architect. My analytical left brain is always being challenged by my creative right brain with music, painting, poetry, photography.... yet to find the winner..

বাতায়ন পত্রিকা **BATAYAN INCORPORATED, Western Australia** দ্বারা প্রকাশিত ও সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত । প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ছাড়া, এই পত্রিকায় প্রকাশিত যে কোন অংশের পুনর্মুদ্রণ বা যে কোন ভাবে ব্যবহার নিষিদ্ধ । রচনায় প্রকাশিত মতামত সম্পূর্ণ ভাবে রচয়িতায় সীমাবদ্ধ ।

Batayan magazine is published by **BATAYAN INCORPORATED, Western Australia**. No part of the articles in this issue can be re-printed without the prior approval of the publisher. The editors are not responsible for the contents of the articles in this issue. The opinions expressed in these articles are solely those of the contributors and are not representative of the Batayan Committee.

সম্পাদকীয়

"How sweet the past is, no matter how wrong, or how sad.
How sweet is yesterday's noise."

The Southern Cross /Charles Wright

স্মৃতি সততই সুখের। যে পথ পার হয়ে এসেছি ঘুরে দেখলে সে পথের বাধা তেমন কঠিন মনে হয় না আর। পথটা যে পার হয়ে আসা গেছে এটাই সামনে চলার প্রেরণা যোগায়। শেষ হতে চলেছে আরো একটি বছর। শুধু বছর নয়,একটা দশক। ইংরাজী ২০১৯ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক শেষ হবে। এই বছর বা দশক শেষশুরুর খেলাটা খুব নতুন কোন ঘটনা নয়। মানুষ যেদিন থেকে সময়ের একক আবিষ্কার করেছে সেদিন থেকে চলছে এই খেলা। কিন্তু সময়ের প্রবাহ অনন্ত। তার আবার শুরু-শেষ কি ? সময়ের শুরু বা শেষ হয়তো নেই। আমরা নিজেদের জীবনের নশ্বরতার কারণে বোধহয় সময়কে দিন,মাস, সপ্তাহ, বছর ইত্যাদির গন্ডীতে সীমাবদ্ধ করি। এতে করে চলমান জীবনপ্রবাহের ক্যানভাসে ঘটে চলা ঘটনাগুলোকে নির্দিষ্ট স্থানবিন্দু দেওয়া যায়।

পৃথিবী জুড়ে যে সব ঘটনা ঘটে চলেছে এই মুহূর্তে তাতে মানুষের প্রতি আস্থা হারিয়ে যেতে চায়। ভারতবর্ষও তার ব্যতিক্রম নয়। এইরকম অস্থির পরিস্থিতিতে মানুষের আবেগ অনুভূতির জগৎ দারুণভাবে আলোড়িত হয়। সামাজিক, রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্যে মানুষের সৃষ্টিশীল কাজের উদ্দীপনাও বাড়ে। সাহিত্য-শিল্প-সংস্কৃতির জগতে এর বহু উদাহরণ আছে। অসির চেয়ে মসীর জোর চিরকালই বেশী। তাই প্রতিবাদের ভাষা গান, কবিতা, গল্প, নাটকের মাধ্যমে প্রকাশের পথ খুঁজে নেয়। শুধু প্রতিবাদ নয়। অন্তরের শুভ চেতনা জাগাতেও সাহিত্য যুগে যুগে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। আশা করি নতুন দশকে মঙ্গলের পথ, কল্যাণের পথে চলার দিশারী হয়ে উঠবে সাহিত্য। এ আঁধারের গায়ে আবার ফুটবে নতুন তারা। এই ভরসায় ২০১৯ এর শেষ বাতায়ন, দিশারী, প্রকাশিত হল। নানা স্বাদের গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, ভ্রমণকাহিনী দিয়ে সাজান এবারের সংখ্যাটি।

২০১৯ কেমন কাটল বাতায়নের ? ফিরে দেখলে মনে হয় বাতায়ন পরিবার যেন একটা ক্যালাইডোস্কোপিক ছবি । গত পাঁচ বছরে আমাদের সেতুবন্ধন দৃঢ় থেকে হয়েছে দৃঢ়তর । সিডনি, মেলবোর্ন, পার্থ, কলকাতা, শিকগো, হিউস্টন, অ্যান-আরবর – বন্ধুরা আছেন নানা শহরে । বাতায়নের আঙিনায় দেখা হয় পস্পরের সঙ্গে । ভাবনা ও অনুভূতির বিনিময় হয় । এই ভাব বিনিময়ের মাধ্যমে ভৌগোলিক সীমানার বেড়াজাল পার হয়ে একটা যোগসূত্র তৈরী হয়েছে নানা দেশের নানা শহরের মানুষের মধ্যে । বিভেদ ও বিচ্ছন্নতার বিরুদ্ধে লড়াই-এর এও একরকম হাতিয়ার । আগামী বছরে আপনারা সকলে আরও বেশী করে মেলবন্ধনের ডাকে সাড়া দেবেন ২০১৯-এর বিদায়কালে "বাতায়নের" এই স্বপ্ন আর আশা ।

সংখ্যার গোড়াতেই আছে কিছু বিশেষ রচনা। সাহিত্যিক নবনীতা দেবসেনকে নিয়ে। এ বছর ৭ই নভেম্বর আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন তিনি। শোক আছে সেটা ঘিরে। তিনি নিজে আজীবন অফুরন্ত জীবনীশক্তির পরিচয় দিয়েছেন। সেই দৃষ্টান্তে উদ্বুদ্ধ হয়ে শোক অতিক্রম করার শক্তিও আমাদের হয়েছে। তাঁর মৃত্যুহীন প্রাণের উদ্দেশ্যে বাতায়ন পত্রিকার পক্ষ থেকে আমরা ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানাই। কবি তন্ময় চক্রবর্তী, মেলবোর্নবাসী ছন্দসী বন্দ্যোপাধ্যায়, শিকাগোর দেবীপ্রিয়া রায় ও কলকাতার মানস ঘোষ ও সৌমিত্র চক্রবর্তীর কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। তাঁদের লেখাতেই আমাদের নবনীতা – শ্রদ্ধার্ঘ্যের ডালি সাজান।

সকলে ভাল থাকবেন। আগামী দশকের প্রথম বছর আপনাদের সকলের ভালো কাটুক। স্বাস্থ্য, শ্রী আর সম্পদে ভরে উঠুক সকলের জীবন – "বাতায়ন" পত্রিকার পক্ষ থেকে এই কামনা জানাই।

আগামী বছরের জন্য আন্তরিক শুভেচ্ছা, ভালবাসা ও বন্ধুত্বসহ –

রঞ্জিতা চট্টোপাধ্যায়
বাতায়ন সম্পাদিকা, বাংলা বিভাগ

সিডনিতে "বাতায়নের" আড্ডা

স্মৃতিচারণ

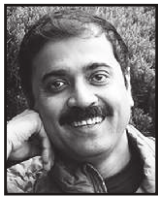
‘প্রথম প্রত্যয় পড়েছ ?’ 8
তন্ময় চক্রবর্তী

নবনীতার স্মরণে :
টুক্‌রো টুক্‌রো স্মৃতি 10
ছন্দসী বন্দ্যোপাধ্যায়

নবনীতা 17
দেবীপ্রিয়া রায়

প্রণাম ও স্মরণে 23
কবি ও সম্পাদক 38
মানস ঘোষ

ভালোবাসার এক টুকরো 24
সৌমিত্র চক্রবর্তী

গ্লিসারিন সাবান 29
ফিরে যাই চল 30
শুভ্র দাস

মন ভাসে না 31
তাপস কুমার রায়

স্মৃতি 31
স্বর্ভানু সান্যাল

নগ্ন 32
উদ্দালক ভরদ্বাজ

মায়াবী পৃথিবীর কবিতা 36
তপনজ্যোতি মিত্র

মফঃস্বলের লেখা 37
সঞ্জয় চক্রবর্তী

কাব্যে প্রকাশ

মহীরুহ 26
জিজ্ঞাসা 27
সুজয় দত্ত

প্রিয় অস্ট্রেলিয়া 28
আশীষ ভট্টাচার্য

কবিতা সিরিজ 39
পারিজাত ব্যানার্জী

কবি ও প্রেমিকা 40
সৌমিক ঘোষ

গল্প

প্রাণগোপাল 41
ইন্দ্রাণী দত্ত

কোহিনূর পাঞ্জাবি স্টোর্স 45
চুমকি চট্টোপাধ্যায়

বাসকিনস রবিনস ও বনমালা 47
শাশ্বতী বসু

স্বপ্নের যাদুঘর 53
বিশ্বদীপ চক্রবর্তী

রম্যরচনা

বিদেশিনী-২ 60
জয়ন্তী বন্দ্যোপাধ্যায়

ছিটা রুটি 63
কল্যাণী রমা

প্রবন্ধ

রূপতাপস রামকিঙ্কর –
ব্যক্তিগত শ্রদ্ধার্ঘ্য 65
রঞ্জিতা চট্টোপাধ্যায়

কৃষ্ণ গহ্বর (Black Holes) 72
প্রদীপ্ত গুপ্তরায়

ভ্রমন

গৌহাটি সফর 78
মনীষা বসু

“ভালোবাসা কারে কয়”

প্রজ্ঞার দ্যুতিতে, কৌতুকের ঝরনাধারায়
তুমিই তো ছিলে ‘সই’, ভালোবাসার বারান্দায় !
পান্ডিত্যের জগৎজোড়া খ্যাতি, তবু কাব্যে, অন্বেষণে অবিচল অক্ষরযাপন ...
সবাইকে আপন করে হে আনন্দপ্রাণ, তুমিই তো মূর্তিমতী ভালোবাসার সাতকাহন !

সাহিত্যিক নবনীতা দেব সেনের প্রতি বাতায়নের শ্রদ্ধার্ঘ্য

তন্ময় চক্রবর্তী

‘প্রথম প্রত্যয় পড়েছ ?’

ম্যান্ডেভিলা গার্ডেন্সের দশতলার ঘরে জমায়েত । সুনীলদা (গঙ্গোপাধ্যায়) সদ্য সদ্য আমাদের ছেড়ে নিরুদ্দেশ যাত্রায় চলে গেছেন । তাঁকে ঘিরে স্মরণ রবীন্দ্রসদনে । আমাদের রিহার্সাল চলছে । সুবোধদা (সরকার), শিবাশিসদা (মুখোপাধ্যায়), শ্রীজাত আরও কারা কারা । সুবোধদা হারমোনিয়ামে ‘জয় তব বিচিত্র আনন্দ’ ধরেছেন । আমরা গলা মেলাচ্ছি । পিছনে চেয়ারে বসে উদাসভাবে তাল রেখে চলেছেন যিনি, তিনিই নবনীতাদি (নবনীতা দেব সেন) । গান শেষ, চা সিঙ্গাড়া চলছে । প্রণাম করে জিজ্ঞেস করলাম, কেমন আছেন ? বললেন, ‘তোমাকে তো ঠিক চিনতে পারলাম না ?’ আমার পাশে সুদীপ (চক্রবর্তী) দাঁড়িয়েছিল । বললেন এই টাক মাথাটাকেও ঠিক চিনতে পারলাম না । অতঃপর আমি সুদীপকে আর সুদীপ আমাকে পরিচয় করিয়ে দিল । বললেন খুব ইচ্ছে করে তোমাদের সঙ্গে গান করি । গলাটা জুতে নেই আর স্টেজে অতক্ষণ দাঁড়াতে পারবো না । হাঁটুতে অসুবিধা । আমি আগ বাড়িয়ে বললাম আপনার অনেক লেখা পড়েছি । উনি ভ্রু কুঁচকে জিজ্ঞেস করলেন ‘প্রথম প্রত্যয়’ পড়েছ ? প্রশ্ন কমন পড়েনি । আমি দ্বিধাহীন উত্তর দিলাম, ‘না পড়িনি’, মুচকি হেসে বললেন ওটা আমার প্রথম কবিতার বই । তারপর হিসেব কষে বললেন তোমার জন্মের দশ-এগারো বছর আগে লেখা । এই হল প্রথম কথোপকথন ।

আর একদিন এক অনুষ্ঠানের শেষে মঞ্চ থেকে নামছেন । ভাবলাম দেখে বোধহয় চিনতে পারবেন না । বললেন, কেমন আছো ? তুমি রবিঠাকুরকে নিয়ে নাকি একটা কবিতার বই লিখেছ ? আমি মাথা নাড়তেই বললেন, একদিন এসো । ফটোগ্রাফার, আপনজনের ভীড়ে মিলিয়ে গেলেন ।

সুনীলদা থাকাকালীন মাঝেমধ্যে সন্ধেবেলায় কৃত্তিবাসের বৈঠক হত। ঠিকানাটা ঠিক মনে নেই। লেকের কাছেই কোনো এক বিল্ডিং এর চারতলায়। সেদিন ওনাকে দেখেছিলাম সবশেষে কবিতা গড়তে আতস কাচের মত একটা লেন্স হাতে নিয়ে।

এক রবিবার, কৃত্তিবাসের আড্ডা বসেছে। পিনাকীদা (ঠাকুর) লেটে এসেছেন। সুনীলদা ভরাট গলায় জিজ্ঞেস করলেন, কী পিনাকী, এত দেরি করে এলে যে, পিনাকীদা বললেন, আর সুনীলদা, সেই বাঁশবেড়িয়া থেকে আসছি। সুনীলদা নবনীতাদির প্রসঙ্গ টানলেন। আরে পিনাকী ওকে দেখো। এই শুনবে ব্যথায় কাশিতে জ্বরে কাতর। পরদিনই দেখবে দূরে বিদেশে গিয়ে বসে আছে।

লেখায়, কবিতায় লাইনে লাইনে ভালোবাসার শব্দ থাকলেও একবার এক সাহিত্য সভায় বললেন বাংলার দুর্ভিক্ষ, দেশভাগের সময় উদ্বাস্তুদের কলকাতার রাস্তায় ভীড়, আর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বোমা পড়ার ভয় তার ভাবনাকে এখনো নাড়া দিয়ে যায়।

ট্রাকে চড়ে উত্তর পূর্বভারত আর তিব্বতে 'ট্রাকবাহনে ম্যাকমোহনে', কুম্ভ মেলায় এক মহিলার বর্ণনায় 'করুণা তোমার কোন পথ দিয়ে', আর কবিদের লেখকদের জন্য অবশ্যই 'সীতা থেকে শুরু'। নক্‌শাল আন্দোলনে এক মনস্তাত্ত্বিক বর্ণনা ছিল 'আমি অনুপম' উপন্যাসে। এটিই তাঁর প্রথম উপন্যাস যা আনন্দবাজার পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল।

একবার সুনীলদা আমাদের নিমন্ত্রণ করলেন। শনিবারের এক সন্ধ্যায় রবীন্দ্রসদনে। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'শাজাহান' অবলম্বনে নাটক। আয়োজনে বুধসন্ধ্যা। মঞ্চে একসময় সুনীলদা আর নবনীতাদি। কে কোন চরিত্রে আজ মনে নেই। শুধু মনে আছে নাটক শেষে মঞ্চের পিছনে নবনীতাদিকে দেখলাম আমাদের জিজ্ঞেস করতে, শিশুর মাতা, কেমন করেছি রে ? সুনীলদাকে দেখতেই বলে উঠলেন, জানোতো প্রজার চরিত্রের ডায়ালগ সুনীলের নিজের লেখা।

বইমেলায় একবার কৃত্তিবাসের অনুষ্ঠানে দেখা। হাঁটুর অসুবিধায় মঞ্চে উঠতে পারছেন না। মঞ্চের সামনেই ফুলের তোড়া হাতে তুলে দিলাম। মাথায় হাত দিয়ে স্মিত হাসি।

''ঝরে যাক কিছু উষ্ণতা বড়ো রাস্তায়
নর্দমাক্ত কর্দমাক্ত রক্তে
লেগে থাক কিছু প্রামাণ্য শেষচিহ্ন
তোমারই ত্রস্ত অবিশ্বস্ত ভক্তের . . .''

কবি তন্ময় চক্রবর্তী – পেয়েছেন কৃত্তিবাস, মহাশ্বেতা দেবী, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় পুরস্কার ও পদক। কাব্যগ্রন্থ এ পর্যন্ত ৯ টি। তারমধ্যে 'ডোভার লেনের রাত্রি' (সিগনেট প্রেস), 'আমার রবিঠাকুর' (প্রতিভাস) বিদগ্ধ পাঠক মহলে সমাদৃত। দেশে ও বিদেশের নানা সাহিত্যসভায় ওনার কবিতা পাঠ বিশেষ জনপ্রিয়তা পেয়েছে।

ছন্দসী বন্দ্যোপাধ্যায়

নবনীতার স্মরণে : টুক্‌রো টুক্‌রো স্মৃতি

অনেক বছর আগে। তখন আমি এলাহাবাদে। দশম শ্রেণীর ছাত্রী। নবকল্লোল পত্রিকার এক শারদীয় সংখ্যায় পড়েছিলাম দারুণ একটি ছোট গল্প। লেখিকার নাম নবনীতা দেবসেন। সেই থেকে বিভিন্ন বাংলা পত্রিকায় খুঁজে বেড়াতাম নবনীতার লেখা – সে ছোট গল্প হোক্, বা হাসির গল্প হোক্ অথবা ভ্রমণ কাহিনী। সেই সময় থেকেই আমার প্রিয় লেখকদের তালিকায় নবনীতা দেবসেন ছিলেন শীর্ষে।

অনেক বছর পর, আমি তখন মেলবোর্ন বাসিনী, একদিন হঠাৎ শুনতে পেলাম এখানকার কয়েকটি স্থানীয় সাহিত্যগোষ্ঠির আমন্ত্রণে নবনীতা দেবসেন বেলবোর্ন আসছেন।

অবশেষে ২০০৪ সালের শেষাশেষি, বিদেশের মাটিতে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল নবনীতার। সেবার নবনীতা আর শ্রাবন্তী আমাদের বাড়িতে আতিথ্য নিয়েছিলেন কয়েকদিনের জন্য। ২০০৪ সালের নভেম্বর মাসের এক সন্ধ্যায় বাংলা সাহিত্য সংসদ আয়োজিত অনুষ্ঠানে শ্রোতাদের নিয়ে নানা আলোচনায় জমে উঠেছিল নবনীতার আসর। নিজের কতকগুলি কবিতা আবৃত্তি ক'রে শুনিয়েছিলেন তিনি এবং পাঠ ক'রেছিলেন তাঁর বিভিন্ন লেখা থেকে কিছু কিছু অংশ। তাঁর একটি মত স্পষ্ট জানিয়েছিলেন তিনি – বাংলা সাহিত্যে প্রতিভাবান অনুবাদকদের প্রভূত প্রয়োজন, যাঁরা সমগ্র বিশ্বের সামনে তুলে ধরতে পারবেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে আরও অনেক বাংলা লেখকদের।

আর একজন শ্রোতার প্রশ্নের উত্তরে শুনিয়েছিলেন তাঁর "নবনীতা" নামকরণের ইতিহাস। নবনীতার মা রাধারানী বিধবা হয়েছিলেন তেরো বছর বয়সে। তারপর আটাশ বছর বয়সে তাঁর পুনর্বিবাহ হয়েছিল কবি নরেন্দ্র দেবের সঙ্গে। নবদম্পতি যখন বিবাহের পর আশীর্বাদপ্রার্থী হয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে গেলেন, তিনি নববধূকে নাম দিয়েছিলেন "নবনীতা"। কিন্তু রাধারানী সেই নাম প্রত্যাহার করেছিলেন তাঁর বৈধব্যময় অতীতের কথা মনে ক'রে। আট বছর পর, যখন রাধারানীর একটি মেয়ে হ'ল, রবীন্দ্রনাথ আবার তাঁর নাম দিলেন "নবনীতা"। এবার সেই নাম নিয়ে কোন আপত্তি উঠল না।

নবনীতার অসংখ্য ছোট গল্পগুলোর মধ্যে অনেকগুলোই হাসিকৌতূকে ভরা এবং সেই সব গল্পের মধ্যে তাঁর অসাধারণ হাস্যবোধের (Sense of humour) পরিচয় পাওয়া যায়।

তাঁর লেখা "মধ্যরাতের ভয়ঙ্কর" গল্পটির আমুদে আকর্ষণ, একাধিকবার পড়া সত্ত্বেও আজও আমি কাটাতে পারি নি। এই গল্পে নবনীতা তাঁর দুই কিশোরী কন্যার সঙ্গে মধ্যরাতে মোপেড চালানো শেখার অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন। বড় মেয়ে

অন্তরার মোপেড। সেটা চালাতে পারলে বিনিময়ে সে তার মায়ের গাড়িখানা চালাবে, এটাই ছিল শর্ত। তা মোপেড চালনা শেখার অভিযানে নবনীতার পেছনে চলল দুই মেয়ে, পিকো আর টুম্পা এবং ওঁর সংসারের তত্ত্বাবধায়ক কানাই, রানী আর জনৈক বৃদ্ধ ভিখিরি। এই গল্পের কিছু কিছু অংশ মেলে ধরলাম আপনাদের সুমুখে :

. . . . . প্রথমে আমি মেয়ের দেখাদেখি ঝাঁকুনি দিয়ে দিয়ে গাড়ি স্টার্ট দিতে চেষ্টা করি, কিছুতেই হয় না। মেয়েই স্টার্ট দিয়ে দিল। তারপর প্রায় হাঁটু অবধি শাড়ি উঠিয়ে "যা থাকে কপালে" বাঘের পিঠে জগদ্ধাত্রীর মতো তো অধিষ্ঠিত হলাম পাদপীঠে। পা রাস্তায়। ছোট মেয়েটা ভীতু। সরু গলায় "ওমা ? মা ? পড়ে যাবে না তো ?" বলে উঠল। বড়টি সাহসিকা – "চুক্কর তো। পড়বেন কেন ? মা তো সাইকেল চালাতেন কলেজে। সাইকেল প্রতিযোগিতায় তিন-তিনটে মেডেল আছে না !"

. . . . . (নবনীতা) "এই তো ? এমনি করে তো ? বেশ, একটু ঠেলে দে আগে, নইলে এগুবো কী করে ?"

– (পিকো) "ঠেলবো কি গো ? নিজে নিজে যাবে। স্টার্ট তো দিয়েই দিয়েছি, এবার দু'পাশে পা রেখো, হ্যাঁ,. . . ব্যাকটা তুলে নাও . . . হ্যাঁ. . . রাকটা তুলে নাও . . . হ্যাঁ . . . বাঃ, এবারে অ্যাকসেলারেট . . ."

বলতে না বলতেই গাড়ি তীরবেগে বেরিয়ে যায়। আমি সমেত। দু'পাশে দুই কন্যা প্রাণপণে ছুটছে, পিছনে পিছনে কানাই, তার পিছনে পিছনে রানী, তার পিছনে বাটি লাঠি পুঁটুলি বগলে বৃদ্ধ ভিখিরি, তিনিও খুবই জড়িয়ে পড়েছেন এই এক্সপেরিমেন্টে। আর রানী আমাদের বাড়ির সামনে রাস্তার ওপরে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে গলা চিরে চেঁচিয়ে চীয়ার-গার্লের কর্তব্য পালন করছে। চেঁচাচ্ছি অবশ্য আমরা সকলেই, কিন্তু ঠিক ঐক্যতানে নয়। যে যার স্বকীয়তা বজায় রেখে। একেই কি বলে হার্মনি ?

বড় কন্যা – "ঠিক হচ্ছে মা, ঠিক হচ্ছে, চলতে থাকো . . . "

ছোট কন্যা – "ওরেব্বাবা মাগো পড়ে যেও না যেন – দেখো বাবা। ওগো, মাগো, যেন পোড়ো না" –

কানাই – "অ দিদি ! অ দিদি ! অত জোরে ন-য় – আস্তে করুন, আস্তে করুন –"

ভিখিরি বৃদ্ধ – "ওগো তোমরা সবাই থামো না একটু। – তোমরা একটু থামো দিকিনি – আমার বৌদিদি ঠিকই চলে যাবে এখন দুগগাঃ দুগগাঃ – অত কথা বললে কি আর মাথার ঠিক থাকে কাউর" –

রানী – "ও মাগো, কী হবে গো ? এ কী কান্ড গো ? বাড়ির গিন্নি যে মপেটও চালাচ্চে গো" – মোপেড – "ভটর ভটর ভ্যাট ভ্যাট ভ্যাট ভ্যাট" –

আমি – (মনে মনে ইষ্টমন্ত্র, আর মুখে)

– ওরে ওরে নামবো যে রে – ওরে নামবো – ওরে থামবো কী করে – ওরে এটা যে থামছে না রে –"

ছুটতে ছুটতে মোপেড শিক্ষিকা দ্রুত ইন্সট্রাকশন দিতে থাকেন –

– "স্পীড কমিয়ে দাও, স্পীড কমিয়ে দাও, পা মাটিতে, পা মাটিতে ঠেকিয়ে দাও, মাটিতে পা ঠেকিয়ে –"

ছুটতে ছুটতে কাঁদো কাঁদো ছোট মেয়ে – "পা মাটিতে পা মাটিতে, অমা গো, পা মাটিতে মা – " ছুটতে ছুটতে কানাই –

– "দিদি, দাঁইড়ে পড়ুন – পা মাটিতে নাবিয়ে ফেলুন, দাঁইড়ে পড়েন – নাবিয়ে দ্যান-পা-টা"

ছুটন্ত ভিকিরি – "বৌদিদি আপনিই লেবে যাবে খনি – তোমরা আর ওকে ঘাবড়ে দিওনি – তোমরা চেঁচানি থামালিই উনি লেবে পড়বে –"

উচ্চকিত রানী – "আর উদিগে যেয়ে কাজ নি গো দিদিমুনি – ঢের হয়েচে – উদিগপানে আর যেয়োনি – উদিকে গরু – গুঁতিয়ে দিবে, উদিগে গরু" –

. . . আর 'যেয়োনি'! হুঁ। যেয়ে তো পড়েইছি। একেবারে খাটালের সামনে। ফুটপাতের ওপরে গোল হয়ে বসে নিরীহ বিহারী গয়লারা ঢোলক বাজিয়ে গলা ছেড়ে ভোজপুরী রামাহো গাইছিল। . . . তারা প্রাণের আনন্দে আর ঢোলের শব্দে আমার প্রাণঘাতী ভ্যাট ভ্যাট শুনতে পায়নি। সহসা উদিত হয়ে তাদের জলসা থেকে ইঞ্চিখানেক দূরে ঠাশ করে গাড়িটাকে ফেলে দিয়েই সার্কাসের কায়দায় সাড়ে তিন হাত লম্ফ দিয়ে ওদের উল্টোদিকে নেবে পড়লুম। সেও চমৎকার স্পেস সেন্সের প্রমাণ দিয়ে, গোবরগাদা থেকে আধ মিলিমিটার তফাতে। গাড়ি পপাত, গয়লারা অনাহত, আমিও অনাহত। সবাই ঠিকঠাক।

শাড়ি ঝাড়তে ঝাড়তে ভাবলুম – "অনেকটা সাইকেলের মতোই" – ততক্ষণে হাঁপাতে হাঁপাতে আমার রেজিমেন্ট এসে পড়েছে। বীরগর্বে বলি – "বেশ সোজা। ঠিকই বলেছিলি, অনেকটা সাইকেলের মতোই।"

বড় মেয়ে (সস্নেহে) – "দেখলে তো ? এই তো বেশ চড়তে পেরে গেলে। গুড !"

বৃদ্ধ ভিকিরি – "কিন্তু বৌদিদি অতো ডাইনে-বাঁয়ে প্যাঁচ কষছিলেন ক্যানে ? সিধে যেতে পারেন নাকো ? সিধে যাওয়াই তো ভালো।"

কানাই, (সগর্বে) – "আর একটু প্র্যাকটিস কল্লিই সিধে যেতে পারবেন – ব্যালান্সটা এসে যাবে – প্রেথমবারেই দিদি প্রায়ই শিখেই ফেলেছেন" –

ছোট মেয়ে, (সভয়ে) – "থাক, আর শিখে কাজ নেই। এই পর্যন্তই থাক। মা আর একটু হলেই গয়লাদের চাপা দিয়ে দিচ্ছিলেন। নিজেই গোবরগাদাতে পড়ে যাচ্ছিলেন, অল্প একটুর জন্যে, নেহাৎ বাই চান্স –"

রানী (দূর থেকে, অদৃশ্য দেবতাদের নমস্কার করে) –

"দুগ্গা দুগ্গাঃ! অ বড়দিদি ছোড়দিদি, তোমাদের মা জননীকে এবার ডাকো – ভালোয় ভালোয় ঘরে ফিইরে নে এসো বাছারা – আর মপেট চালিয়ে কাজ নেই গো মায়ের – ঈ কী পেহাড়" –

এরকম অভিজ্ঞতার পরেও কিন্তু নবনীতা অদম্য। পরের দিন রাত্রিবেলা মপেড আর দলবল নিয়ে তিনি চলে গেলেন স্বয়ং জ্যোতিবাবুর বাড়ির এলাকায়। কারণ – . . . মাননীয় জ্যোতিবাবুর বাড়ির ওদিকটায় "খাটাল নেই, গয়লা নেই . . . একদম ফাঁকা।

কিন্তু এ কী হলো হঠাৎ ? বাপরে মরে গেলুম, মরে গেলুম। ছ্যাঁক করে পায়ের ডিমে একটা গরম আগুনের ছ্যাঁকা কে যেন লাগিয়ে দিলে। ওমনি আপনা আপনি হাত কেঁপে উঠে অ্যাকসেলারেটর ঘুরিয়ে ফেলেছি ছ্যাঁকার চোটে, সঙ্গে সঙ্গে স্বয়ংক্রিয় রোবটের স্টাইলে লাফিয়ে উঠে জ্যামুক্ত তীরের মতো নাকের সোজা ছুটলো আমার সপ্ত-ঘোড়ার বাহন, একেবারে পুষ্পকরথের মতো – মাটিতে না আকাশপথে তাও ঠিক বুঝতে পারছি না – কানে এলো পরিত্রাহি চীৎকার – সবার ওপরে আমারই গলা :

আমি – "আমি নামবোঁ, ওরে আমি নামবোঁ" . . .

ছুটন্ত বড় কন্যা – "ব্রেক, ব্রেক, সঙ্গে সঙ্গে অ্যাকসেলারেরটা উল্টোদিকে ঘোরাও – ব্রেক ব্রেক।"

ছুটন্ত ছোট কন্যা – "অ মা মাগো, নেমে পড়ো মা, ব্রেক দিয়ে দাও মা, ব্রেক – মা গো অ মা" –

ছুটন্ত কানাই – "ব্রেক ডান হাতে, অ দিদি, ব্রেকটা ডান হাতে, দিদি, ব্রেক ডান হাতে" –

ছুটন্ত ভিকিরি – ওরে মুখপোড়া তুই থাম না রে, বৌদিদি ঠিকঠাক বেরেক মারবে, তোরা থামলিই বেরেক মারবে, তোদেরকে চেঁচাতে হবে না ব্যাটারা" – বাড়ির সামনে দন্ডায়মান রানী – "হায় হায় হায় – হয়ে গেল ! এইবার ঠিক সব্বোনাশ হবে গো – হে মা দুগ্গা – হে মা দুগগতি নাশিনি – রক্ষে করো মা –"

ছুটন্ত কুকুর "ঘৌ ঘৌ ঘৌ ভৌ ভৌ ছৌ ছৌ ছোঃ ছোঃ !"

উড়ন্ত আমি – "ওরে এযে থামচঁনারে – ওরে এযে থামচেই না –"

ছোট কন্যা – "হে ভগবান" ।

ভগবান শুনতে পেলেন । কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচীর বাড়ি 'ইলাবাস' আর শিল্পী সুনীলমাধব সেনের বাড়ির মাঝবরাবর ভগবান প্রচুর বালি ঢেলে রেখেছিলেন । যেন আমারই প্রতীক্ষায় । পাখির মতো উড়ে গিয়ে আমার মোপেড সেই ঐশ্বরিক বালুকাবেলায় সজোরে ঢুকে পড়ল । মোপেডসুদ্ধু আমি বালির মধ্যে নিঃশব্দে পড়ে গেলুম । . . .

তারপর বাড়ি ফিরে এসে মায়ের মুখোমুখি নবনীতা –

. . . ওদিকে রাস্তায় যে কীদৃশ্য নৈশবিপ্লব ঘটে যাচ্ছে মা কিছুই টের পাননি । এক মুখ উজ্জ্বল হেসে মা আমাকে রিসিভ করলেন ।

– "আয় । বোস । হলো শেখা ?"

– "ওই একরকম ।"

– "পারলি চালাতে ?"

ঠিক এমন সময়ে কানাই এসে বললো :

– "দিদি, বার্নাল ।"

– "বার্নল ? কেন রে, বার্নল কী হবে ?"

– "পা পুড়ে গেছে দিদির ।"

– "খুব লেগেছে, না মা ? দেখি দেখি –"

– "আশ্চর্য । আমরাও চড়ি, কখনো পা পোড়ে না, তুমি পোড়ালে কেমন করে বলো তো ?"

– "পা পোড়ালি কি না গাড়ি চালাতে গিয়ে ? একি রান্নাবান্না ? আশ্চর্য মেয়ে বাপু !"

. . . – "বেশি লাগেনি । একটুখানি ফোস্কা ।" লজ্জিতভাবে বলি ।

. . . সাহস করে বলে ফেলি :

– "পায়ে ছ্যাঁকাটা যদি না লাগতো মা –"

– "পিকোর কি ছ্যাঁকা লেগেছিলো ?"

– "ও তো জিন্‌স্ পরে ।"

– "তোমাকে জীনস পরতে কে বারণ করেছিলো ? যে দেবতার যা মন্তর ।"

– "যাঃ বাবা! মোপেডের জন্য জীনস পরে শেষে যাদবপুরে ? থাক মা, আমার ভাঙা গাড়িটাই ভালো" । . . .

* * * * *

মেলবোর্নে থাকাকালীন এক সন্ধ্যায় তাঁর বন্ধু প্রফেসর ফিলিপ ডার্বির আমন্ত্রণে মেলবোর্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত পোস্ট কলোনিয়াল স্টাডিস বিভাগে নবনীতা গিয়েছিলেন একটি সাহিত্যিক সেমিনারে । আজও মনে পড়ে, একটা মজার ঘটনা ঘটেছিল সেখানে । আমরা যখন গিয়ে পৌঁছলাম আমন্ত্রিতরা তখন ড্রিংক্স্ হাতে নিয়ে নানা আলোচনারত । তাঁদের মধ্যে কয়েকজন সহসা "গুড ইভনিং, নবনীটা, হ্যালো নবনীটা" ইত্যাদি বলতে বলতে এগিয়ে এসে আমাকে সম্বর্ধনা জানালেন । দারুণ অপ্রস্তুত অবস্থা তখন আমার । পাশে দাঁড়িয়ে থাকা নবনীতাকে তক্ষুনি ওঁদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়ে আমি অতিথিদের সেই বৃত্ত থেকে অনেকখানি দূরে সরে গিয়ে দাঁড়ালাম ।

আর একদিন । আমরা ওঁকে নিয়ে গিয়েছিলাম শ্যান্ডন ওয়াইনরিতে । সেখানে লাঞ্চ সারার পর ঘুরে ঘুরে ওয়ানাইরির বাগানে অজস্র আঙুরলতাদের দেখলাম । আর দেখলাম আগাগোড়া ওয়াইন তৈরি প্রক্রিয়ার খুঁটিনাটি । ওয়াইন টেস্টও করেছিলাম সকলে আর তখনি প্রমাণ হয়ে গিয়েছিল যে নবনীতাই আমাদের মধ্যে সব চেয়ে বিচক্ষণ ও উৎসাহী ওয়াইন টেস্টার ।

সেবার অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যান্ডের কয়েকটি শহরে সাহিত্য অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়েছিল নবনীতাকে কেন্দ্র করে । দেশে ফিরে গিয়ে তাঁর সেই যাত্রার সকল অভিজ্ঞতা সবিস্তারে বিবরণ ক'রে ছিলেন "বাংলা লাইভ"-এ ।

সেই থেকে নবনীতার সঙ্গে গড়ে উঠেছিল আমার আর প্রতীশের সখ্যতা । কোলকাতাতেও আমাদের বাড়ি আর নবনীতার বাড়ি 'ভালো-বাসা' ছিল হাঁটাপথের মধ্যে । আমরা ওঁর প্রিয় শ্যান্ডন শ্যাম্পেন নিয়ে চলে যেতাম ওঁর বাড়িতে । উনি তিনতলা থেকে মেকানাইজড চেয়ারে উঠে বসতেই নিমাই স্টার্ট দিয়ে চেয়ারখানা দোতলা অভিমুখে এগিয়ে দিত । আর দোতলার বসার ঘরে বসে আমরা অপেক্ষা ক'রতাম তাঁর 'মর্ত্যে' অবরোহনের জন্য ।

আবার, একাধিকবার আমন্ত্রিত হয়ে গিয়েছি ওঁর বাড়ির জমজমাট আসরে । স্থানীয় সেলিব্রিটিদের আর বিদেশবাসী আঁতেলদের নিয়ে সেই আসরগুলো হয়ে উঠত জমজমাট । রাজরানীর মত তিনি বসে থাকতেন আসরের মধ্যমণি হয়ে সবার মাঝে ।

দেখেশুনে, আমি একদিন অভিযোগ করেছিলাম, "নবনীতা, তুমি যখন তোমার হাই-প্রোফাইল, কৃতী, গুণীজনেদের মধ্যে মহারানী ভিক্টোরিয়া হ'য়ে স্বমহিমায় বিরাজ করো, তখন প্রতীশ আর আমার মত নগণ্য মানুষ তোমার কাছাকাছি বসে মনপ্রাণ খুলে গল্প ক'রতে পারি না । ভারি খারাপ লাগে আমার । তার চেয়ে যখন তুমি একা, আমরা সেরকম একদিনে চলে আসব তোমার কাছে । নিশ্চিন্ত হয়ে বসে গল্প করব ভিড়-ফ্রী পরিবেশে" । এই চুক্তিখানা বজায় ছিল এতগুলো বচ্ছর ।

তবে বিশেষ অবসরগুলোয় – যথা, ওঁর জন্মদিন, বা দূর্গাপূজোর অষ্টমী বা নববর্ষ – যখন আমন্ত্রিত হয়ে আমরা ওঁর বাড়ি গিয়েছি তখন পরিচিত হয়েছি অনেক মাননীয় মানুষজনদের সঙ্গে । আবার একা গিয়েও আমি আর প্রতীশ হামলা করেছি নবনীতার বাড়িতে, একান্তে – বহুবার ।

উদারমনে নবনীতা আমাকে লেখালেখির ব্যাপারে অনেক উৎসাহ দিয়েছেন । মাঝেমাঝে বকুনিও খেয়েছি আমার লেখার গতি ধীরস্থ এবং লেখার সংখ্যা কম বলে । একবার মিন্‌মিন্ ক'রে বলেছিলাম, "আসলে চাকরী, ঘর-সংসার এবং অসংখ্য সামাজিকতায় ব্যস্ত থাকি বলে –"

আমার কথাগুলো শেষ হওয়ার আগেই কড়া ধমক দিয়েছিলেন তিনি, "আর আমি বুঝি চাকরী করি নি? মেয়েদের মানুষ করি নি? ঘর-সংসার চালাই নি? সামাজিকতা করি নি"?

নবনীতার সঙ্গে একান্ত, ওয়ান-টু-ওয়ান আড্ডাগুলোর সময়ে দুটি জিনিস ছিল বিশেষ লক্ষণীয় – তাঁর আতিথ্য এবং তাঁর পশুপ্রীতি।

কানাই ঘরে এসে চায়ের সঙ্গে ট্রে ভর্ত্তি খাবার সাজিয়ে রাখত ছোট ছোট টুলের ওপর। সুন্দর রেকাবিতে গরম গরম কচুরি, আলুর দম, ঘুগ্‌নি, কাবাব, মিষ্টি, পায়েস। পেটের অসুখের আশংকায় আমরা যে বাজার থেকে কেনা খাবার বর্জন করে চলি, জানতেন নবনীতা। তাই কানাই যখন হাসিমুখে খাবার-দাবার সাজিয়ে রাখত আমাদের সুমুখে, তিনি আশ্বাস দিতেন, "এ সবই বাড়িতে করা। কানাই আর তার বৌ নিজে হাতে তৈরি করেছে"।

আর আমরা যখন খাওয়া দাওয়া ক'রতাম, তখন নবনীতার পায়ের কাছে পরম আয়েসে শুয়ে থাকত ওঁর কালো কুচ্‌কুচে কুকুর – কেল্টু কৃষ্ণেন্দু দেবসেন !

আর একটা কথা। লিখতে বসে অনেক সময়ে আমার মনে দ্বিধা জাগে যে আমার লেখা পাঠকদের ভাল লাগবে তো ! রিলেট ক'রতে পারবেন তো আমার গল্পের সঙ্গে তাঁদের অভিজ্ঞতা ? এই প্রসঙ্গে একাধিক লেখককে প্রশ্ন করেছি এবং জেনেছি যে লেখার সময়ে পাঠকেরা নাকি তাঁদের মানসিক মানচিত্রেই থাকেন না। নিজেদের জন্যই নাকি লেখেন তাঁরা। তা ২০১৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে এক সন্ধ্যায় নবনীতার সঙ্গে আমরা যখন দেখা করতে গিয়েছিলাম তখন প্রশ্নটা ওঁকেও করেছিলাম। দৃঢ়স্বরে তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, "লেখকেরা কবিতা লেখেন নিজের জন্য এবং গল্প লেখেন পাঠকদের জন্য"।

সেই সন্ধ্যাতেই শ্রাবন্তীর মুখে শুনলাম নবনীতার ক্যান্‌সার হয়েছে। ইতিমধ্যেই তিনি চিকিৎসা উপলক্ষ্যে বস্টনের ম্যাসাচুসেট্‌স্ জেনারেল হস্‌পিটালে যাওয়া-আসা করেছেন কয়েকবার। থেকেছেন বিচক্ষণ অংকোলজিস্টদের চিকিৎসাধীনে।

নবনীতাকে সর্বদাই আমার মনে হয়েছে অদম্য এবং অনমনীয়। ক্যান্সারের আগেও তিনি হাঁপানীতে ভুগেছিলেন দীর্ঘকাল। চোখের দৃষ্টি নিয়েও একাধিক সমস্যা ছিল তাঁর। কিন্তু শারীরিক কোন উপদ্রবই তাঁকে তাঁর জীবনের সক্রিয়তা থেকে ব্যহত করতে পারেন নি। নানা শারীরিক উপসর্গকে অনায়াসে উপেক্ষা করে তিনি ভ্রমণ করেছেন দেশে-বিদেশে। অনেক সাহিত্য অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছেন এবং বিস্তর পুরস্কারলাভ করেছেন।

এই বছরের গোড়ায়, ফেব্রুয়ারি মাসর সেই সন্ধ্যায় অন্ততঃ দু-আড়াই ঘন্টা ধরে নানা বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা ক'রেছিলাম।

শ্রাবন্তী একসময়ে এসে বলেছিল, মা এবার ওপরে চলো। তোমার ওষুধ খাবার সময় পেরিয়ে যাচ্ছে।

আমরা শশব্যস্তে উঠতে যাব, তিনি ব্যগ্র হয়ে বললেন, না, না তোমরা আরও খানিকক্ষণ বসো। ওষুধ খাওয়া হবে'খন।

তারপর আরও কিছুক্ষণ ওঁর কাছে আড্ডা জমিয়ে অবশেষে এক সময়ে আমরা উঠে পড়লাম। বিদায় নিতে গিয়ে দেখলাম ওঁর দুই চোখের কোনায় চিক্‌চিক্ ক'রছে দু'কণা জলের ফোঁটা।

ওঁর বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে পথে হাঁটতে হাঁটতে মনে হ'চ্ছিল, নবনীতা হয়ত – অনুভব ক'রেছিলেন যে আমাদের সঙ্গে এটাই হবে ওঁর শেষ দেখা।

জীবনের সব সম্পর্ক, আলাপ-পরিচয়, বন্ধুত্বর যেমন একটা শুরু আছে তেমনি একটা সমাপ্তিও আছে। ভাবছি, সত্যিই কি নবনীতার সঙ্গে আমাদের বন্ধুত্বের সমাপ্তি ঘটে গেল ওর মৃত্যুর সঙ্গে? আমার তো মনে হয় না। ওঁর সঙ্গে কাটানো সময়ের অসংখ্য সব স্মৃতির কণা আমার মনের মধ্যে চিক্‌চিক্ ক'রবে, যত দিন বেঁচে থাকব।

ছন্দসী বন্দ্যোপাধ্যায় – জন্ম বারাণসী শহরে। দীর্ঘকাল মেলবোর্ণ শহরের বাসিন্দা। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরাজী সাহিত্যে এম. এ.। মেলবোর্ণের মনাশ ইউনিভার্সিটি থেকে কম্পিউটর সায়েন্সে ডিপ্লোমা। বিভিন্ন সরকারী রিসার্চ বিভাগে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রশাসন ও অধ্যাপনার কাজে যুক্ত ছিলেন। দেশ, সানন্দা, আনন্দবাজার পত্রিকা, নবকল্লোল এবং বর্তমান সহ বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে তাঁর লেখা। উপন্যাস এবং ছোট গল্প প্রকাশিত হয়েছে শারদীয় দেশ, সানন্দা ও আনন্দলোকে। অবসর সময়ে বই পড়তে ভালবাসেন। ভালবাসেন ভ্রমণ। ছন্দসীর প্রকাশিত গ্রন্থ – অভিযান (আনন্দ), মায়াজাল (আনন্দ), ছায়া পরিসর (লাল মাটি প্রকাশন), নির্বাচিত গল্প প্রথম ভাগ (দাশগুপ্ত পাব্লিশার্স) এবং Seven Favourite Stories – translation of seven short stories by Sirshendu Mukhopadhyay (Dasgupta Publishers)। ওয়েব সাইট : www.bando.com.au

দেবীপ্রিয়া রায়

নবনীতা

সকালে ঘুম থেকে উঠে চায়ের কাপ হাতে নিয়েছি । ব্যস্ততার সময় এটা, কাজে বেরুব । তাড়াহুড়ো করে ধোঁয়া ওঠা চায়ে চুমুক দিয়ে আই প্যাডে চোখ ফেললাম । দিন শুরু হওয়ার আগে খবরাখবর জেনে নেওয়াটা রোজকার অভ্যাস । তারপরই একটি খবরের শিরোনামে চোখ পড়তে স্তব্ধ হয়ে গেলাম । নেই তিনি, চলে গেছেন । খানিকক্ষণের জন্য কোন শব্দ কানে এলো না । অতলান্ত নৈঃশব্দের মাঝে কেবল কানে বাজতে থাকল, 'নেই, নেই, নেই'। অপ্রত্যাশিত নয় খবরটা । দিন দুই আগে ভালবাসার বারান্দায় লেখা 'কামেন ফাইট' পড়েই জানা গিয়েছিল যে শেষ যাত্রার প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে । কিন্তু তাও মন বলছিল যে, যে মহামহিমান্বিত ব্যাধিসম্রাট কর্কট মহাপ্রভুর সামনে যিনি ভয়ে নতজানু না হয়ে হাল্কাচালে লড়ায়ের আমন্ত্রণ জানাতে পারেন, বন্ধু আর পরিচিতজনকে নিমন্ত্রণ করে খাইয়ে যাওয়ার জন্য তাঁকে অপেক্ষা করতে বলেন, তিনি কি কখনোই ময়দান ছেড়ে এত শিগ্‌গিরী চলে যেতে পারেন ? এই তো সেদিন নোবেল বিজয়ী অভিজিত বিনায়কের কাঁধে হাত রেখে তাঁর হাসিমুখের ছবি দেখলাম । তাহলে কি হল ? আমাদের মনকে প্রস্তুত হওয়ার সময় না দিয়েই তিনি চলে গেলেন ? মনই এ প্রশ্নের জবাব দিল । তাঁর চলে যাওয়ার জন্য মন কি কখনোই প্রস্তুত হতে পারত ? পারত যে না, তা তিনি নিজেও নিশ্চয় করে জানতেন । তাঁর মতন বিদুষী নিশ্চয়ই মনুস্মৃতির সেই বিখ্যাত শাস্ত্র বাক্যটি জানতেন – মৃত্যু যে কোন সময় তোমাকে কেশাকর্ষণ করে নিয়ে যাবে, তাই নিরবধি ধর্ম আচরণ করে যাও । কিন্তু তারই সাথে এই কথাটিও ভুলোনা যে বিদ্যা আর অর্থ আহরণ করার সময় ভেবে নিও যে জরা, মরণ তোমাকে স্পর্শ করতে পারবে না । জীবনের শেষ লগ্ন পর্যন্ত তাই স্বধর্মে রইলেন নবনীতা দেবসেন । আমৃত্যু অকুতোভয়ে স্বচ্ছন্দে বিদ্যা আহরণ আর বিতরণ করলেন আর তারই সাথে ধর্মে রইলেন অবিচল । তাঁর লেখা তাঁর ধর্ম । সেই ধর্ম অনুসরণ করে লিখে গেলেন সকৌতুক বিদায় বার্তা । বরাবরের মত তিনি আমাদের ঠোঁটে হাসির অভাস ফুটিয়ে চোখে জল আনলেন, মনকে বাধ্য করলেন চিন্তা করতে । আমরা যারা তাঁর শেষ বার্তাটি পড়লাম, বলে উঠলাম, 'শাবাশ, বিজয়িনী ।'

চিন্তা করছি এমনি এলোমেলো । Whatsapp, Messenger, Facebook ভরে উঠল স্বদেশে, এ দেশে, বিদেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বন্ধু বান্ধব বোনেদের মনখারাপের চিঠিতে । কেউ বা তারা সমবয়েসী, কেউ অনেক ছোট, আবার কেউ বয়েসে আমাকে পিছনে ফেলে এগিয়ে গিয়েছেন বেশ খানিকটা । খুব ছোট কন্যাস্থানীয়া একজন বলল, 'বুকের মধ্যে হু হু করছে', আরেকজন কিছুটা সমবয়সিনী লিখলেন, 'চোখের জল মুছছি, আবার চোখ জলে ভরে যাচ্ছে ।' আমি সকলের কথার জবাবে কেবল একটিই কথা ভাবতে পারছি, একটিই কথা বলতে পারছি, 'শেষ হয়ে গেল আমাদের যুগ ।'

এরই মাঝে একজন জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা তাঁর সাথে তোমাদের যুগ শেষ হল, এমনি বা বলছ কেন ? তাঁর সাথে তোমার বয়সের তফাৎ কি নেই ?' তাঁর যুগ তোমার যুগের অনেক আগে শুরু হয়ে যায়নি কি ? সত্যিই তো তিনি আমার থেকে বেশ কয়েক বছর আগে জন্মেছিলেন বলেই তো শুনছি, তবে কেন তাঁকে নিজের যুগের বলে মনে করছি ? প্রিয় লেখক আর লেখিকা কতজনকে তো হারালাম বিগত কয়েক বছরে, তবে তাঁকেই বা কেন নিজের কাছাকাছি বলে মনে হয় ? জ্ঞানে গুণে বিদ্যায় বুদ্ধিতে তো তিনি আমাদের বেশীর ভাগেরই নাগালের বাইরে, তবে কেন মনে হচ্ছে যে যিনি চলে গেলেন, তিনি আমার সমসাময়িক ।

প্রশ্নটির জবাব খুঁজতে খুঁজতে মন হেঁটে হেঁটে ফিরে চলল সেই যুগে, যখন আমরা শৈশব পেরিয়ে সমসাময়িক জগতের মাঝে চোখ মেলছি । বাঙালী তখন প্রাণভরে লেখে আর লেখক সাহিত্যিকদের দেবতার আসনে বসিয়ে রাখে । লেখক, কবি সাহিত্যিক সেদিন বাংলা আর বাঙালী সমাজের অগ্রগণ্য । তাঁদের লেখা সবাই পড়ি, তাঁদের জীবনের ঘটনা, তাঁদের উক্তি তখন মুখে মুখে ফেরে । সেই সময়ের দুই বরেণ্য কবি সাহিত্যিক, যাঁদের সেদিন বাংলার ব্রাউনিং দম্পতি বলা হত, তাঁদের

কন্যা নবনীতা। মনে হল, তাঁর সাথে তো আমাদের পরিচয় আজকের নয়। কোন শিশুকালে তাঁর বাবা মায়ের হাত ধরে আমাদের চলা শুরু। তখনো আমরা নবনীতাকে চিনিনা, চিনি নরেন্দ্র দেবকে আর রাধারাণী দেবীকে, দেবসাহিত্য কুটিরের শিশুদের বার্ষিকীর পাতায় যাঁদের লেখা আমাদের মুগ্ধ করে রাখত। সেই শিশুকাল, যখন আমরা টিনটিন পড়তে শিখিনি, হ্যারি পটার দূর অস্ত – সেই তখন শিশুর জগৎ নিয়ে তাঁদের অপরূপ লেখা আমাদের মন মাতিয়ে রাখত, নবনীতা আমাদের সেই জগতের শেষ স্মৃতি, তার শেষ যোগসূত্র। সে যুগ আজ অতীত, কিন্তু নবনীতা অতীতে বিলীন হয়ে যাননি। বরং স্বচ্ছন্দে পা চালিয়ে এসে বর্তমানের পৃথিবী আর সমাজকে দেখেছেন, বুঝেছেন আর সেই অভিজ্ঞতাকে সরস করে আমাদের সামনে ধরেছেন গল্প কবিতায়, প্রবন্ধে। চলার পথে জীবনের ঘাত প্রতিঘাত সয়েছেন কিন্তু তিক্ত হয়ে যাননি, তাই আমরা শুধু তাঁর শ্রোতা কিম্বা পাঠক হয়ে থাকিনি। বহুলাংশে তাঁকে দেখে গড়ে উঠেছে আমাদের জীবনবোধ। বিপুলা পৃথিবীকে অসম্ভব জিজীবিষায় ঘুরে দেখেছেন, উপভোগ করেছেন প্রতিটি মূহুর্ত। তুলনামূলক সাহিত্যের ছাত্রী হিসাবে দীক্ষাগুরু পেয়েছিলেন পারিবারিক বন্ধু বুদ্ধদেব বসুকে, পরে নিজেই হয়েছেন খ্যাতনামা অধ্যাপিকা। তাঁর গবেষণার কাজ সমাদৃত হয়েছে দেশে বিদেশে। বিশ্ব সাহিত্যের অন্ধি সন্ধি তাঁর জানা, কিন্তু তিনি যখন লিখেছেন তখন তাঁর লেখায় পন্ডিতম্মন্যতার ছাপ পড়েনি কোথাও। সাধারণ বাঙালী পাঠকের জন্য নবনীতা তাঁর লেখায় তুলে ধরেছেন তরুণী অবস্থা থেকে জীবনের পথ হাঁটার আঁকে বাঁকে নানান অভিজ্ঞতার, নানান চরিত্রের ছবি। কি নেই সে সব ছবিতে ? আছে আনন্দ, বিষাদ, প্রেম বিরহ; আছে সন্তান, সংসারের দায়িত্ব সামলে ব্যস্ত অধ্যাপিকা, সাহিত্যিকা মায়ের সময়বিভ্রাটের গল্প, আছে নিজের বিবাহ বিচ্ছেদ নিয়ে অপরের অশোভন কৌতূহল বা অসংবেদনশীল মন্তব্যের কৌতুকপূর্ণ বিবরণ, আছে নিজের বৃদ্ধা মায়ের প্রতি অসম্ভব মমতা ও শ্রদ্ধা, আছে বিনা প্রস্তুতিতে তীর্থযাত্রার বিবরণ। তাঁর একটি গল্পে খ্যাপাটে প্রতিবেশী চৈত্র মাসে ওপরতলার বাসিন্দার কাঁচের জানলা হাওয়ার দাপটে ভেঙে গেলে তাঁর নিজের পা কাটতে পারে বলে বাঁশ দিয়ে সেই জানলার শার্সিটি আগেভাগে ভেঙে রেখে দিতে চেষ্টা করেন।

প্রতিটি ছবি হাসির মোড়কে মোড়া। নবনীতা যেন হাসির পরকলা লাগিয়ে জগতকে দেখছেন। তাঁর লেখার মধ্যে দিয়ে আমরা পাঠকেরা পৌঁছে যাচ্ছি ৬০ এর দশকের বার্কলে বিশ্ববিদ্যালয়ের আঙিনায়, আমেরিকার যুব জগৎ যখন বিদ্রোহে উত্তাল, দুলছে বিটলদের গানের ছন্দে, নতুন নতুন পরীক্ষা নিরীক্ষা চলেছে লেখালেখি নিয়ে, ছাত্রী নবনীতা সে আন্দোলনের শরিক তখন। সদ্য পরিণীতা নবনীতার সংসারে সেদিন অতিথি হয়ে আসছেন বিশ্ববিশ্রুত বিদ্বান কিম্বা যাঁরা ভবিষ্যতে খ্যাতি অর্জন করবেন এমন আরো অনেকে। তাদের কথা বলতে বলতে তিনি আমাদের ঘুরিয়ে আনছেন পশ্চিমের বিদগ্ধ সমাজে, যেখানে দেখা হয়ে যাচ্ছে নাম করা কবি, দার্শনিকদের সাথে। দশকের পর দশক ধরে এ জগতে নবনীতার স্বচ্ছন্দ ঘোরাফেরা, তাঁর সঙ্গী আমরাও। অথচ এই সব গল্প যখন তিনি আমাদের শোনাচ্ছেন, তখন একবারও আমাদের মনে হচ্ছে না যে তিনি আমাদের মাঝে যে কোনজন এক নন। তার কারণ তিনি এরই মাঝে আমাদের শোনাচ্ছেন তাঁর মায়ের অসুস্থ হাঁপানিতে ভোগা মেয়েকে নিয়ে ব্যাকুল উদ্বিগ্নতার কথা। সে গল্প শোনার সময় আমাদের মনেও পড়ছেনা যে সেই মা প্রখর ব্যক্তিত্বশালিনী রাধারাণী দেবী যিনি সেই যুগে ১৪ বছর বয়সে বিধবা হয়ে, পরে কবিতা লেখার সূত্রে পিসীর দেওর নরেন্দ্র দেবকে বিয়ে করেন, প্রমথ চৌধুরীকে চ্যালেঞ্জ করে অপরাজিতা দেবী ছদ্মনামে মেয়েলী ছাঁদে কবিতা লিখে প্রশংসা জিতে নেন, ১৯৫০ সনে এডিনবরায় স্বামীর সাথে অর্ন্তজাতিক লেখক সম্মেলনে পশ্চিমবঙ্গ থেকে যুগ্ম সম্পাদক হিসাবে যোগ দেন; যাঁর উপর শরৎচন্দ্র ভার দিয়েছিলেন তাঁর অসমাপ্ত উপন্যাস, 'শেষের পরিচয়' সমাপ্ত করার আর তার পর যাঁর সংসার গুছিয়ে দিতে সাহায্য করতে তিনি নিজে স্বয়ং গিয়েছিলেন, যাঁর বিবাহ সভায় উপস্থিত ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। শুধুই কি মা ? নবনীতা যখন তাঁর ভালমানুষ বাবাটির গল্প করেন, সদাহাস্যময়, গুম্ফশোভিত, নিয়মানুবর্তী যে মানুষটি হিন্দুস্থান পার্ক রোডের মোড়ের মাথায় কাঠের বেঞ্চিতে বসে পাড়ার লোকেদের সাথে প্রায়ই গল্পগাছা করেন, নিমন্ত্রণের তারিখ ভুলে অন্য দিনে পরিবার শুদ্ধু নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে উপস্থিত হন, আবার হল্যান্ডের ভিসা না বানিয়েই সস্ত্রীক সকন্যা সেখানে ভ্রমণে চলে যান, তখন আমরা নিজেদের ভালোমানুষ ছেলেমানুষ বাবাটিকেই তাঁর মাঝে খানিক খুঁজে পাইনা কি, যদিও আমরা জানি যে তিনি যে সে ব্যক্তি নন। তিনি নরেন্দ্র দেব, যাঁর কলম থেকে বার হয়েছে ওমর খৈয়াম, হাফিজ আর কালিদাসের কাব্যের অনুবাদ; যিনি সিনেমার জগতের খুঁটিনাটি নিয়ে প্রামাণ্য বই লিখে ফেলেন আবার লেখেন এত আধুনিকমনস্ক উপন্যাস, যে

শনিবারের চিঠি তাকে আদিরসাত্মক বলে ব্যঙ্গ করে, যাঁর কল্পনা ও সৃজনশীলতার জন্য আমরা পেয়েছিলাম বাংলা সাহিত্যে প্রথম বারোয়ারী উপন্যাস ও দেশ বিদেশের ভ্রমণকাহিনী 'রাজপুতের দেশ' আর 'সাহেব বিবির দেশে' । তারই সাথে পেয়েছিলাম ছোটদের জন্য লেখা পত্রিকা, নাটক আরো রকমারি গল্প । হয়তো নবনীতা নবনীতা হতে পেরেছেন এমনি বাবা মায়ের রক্তধারা তাঁর ধমনীতে বইছে বলেই । কত সহজে এই অসাধারণ পিতামাতার মানবিক দিকটিকে তিনি আমাদের সকলের কাছে তুলে ধরেছেন, তাই আমরা তাঁর গল্পের সরণি বেয়ে কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছি সেই যুগে, যেখানে বাঙালী প্রতিভা বৈদগ্ধ্যের উন্নাসিকতা না দেখিয়ে অতি সহজে বাঙালী জীবনে বৈদগ্ধ্যের আলো ছড়িয়ে দিয়েছে ।

বস্তুতঃ লেখক লেখিকাদের সাথে সসম্ভ্রম দূরত্ব রেখেও তাঁদের কাছের জগতে নামিয়ে এনেছিলেন নবনীতাই । তিনি বড় হয়েছেন লেখক সাহিত্যিক পরিমন্ডলে । পঞ্চাশ আর ষাটের দশকে যাঁরা প্রথম সারির চিন্তাবিদ, সাহিত্যিক, তাঁরা শুধু তাঁর বাবা, মা'ই নন, তাঁদের অনেকেই তাঁর পিতৃবন্ধু বা প্রতিবেশী । বাঙালী হিসাবে আমরা তাঁদের নাম নিয়ে সেদিন গৌরব করতাম-বুদ্ধদেব ও প্রতিভা বসু, নরেশ গুহ, অজিত দত্ত, সুনীতি চট্টোপাধ্যায়-কে নেই সে তালিকায় । তাঁদের কারুকে তিনি বলেন কাকা, কাকীমা, কারুকে জ্যেঠা, কেউ বা তাঁর কাছে মাসী আর মেসোমশায় । এদের মধ্যে বড় হওয়ার কথা বলতে গিয়ে তিনি গল্প জুড়ে দেন এ বাড়ী ওবাড়ীর ছেলে মেয়েদের সাথে ফুটপাথে হাডুডু বা বুড়ীবাসন্তী খেলার, হাইড্রান্টের গঙ্গাজল দিয়ে রাস্তা ধুয়ে গেলে পাশের নালাতে থিতিয়ে থাকা গঙ্গামাটি নিয়ে পুতুল গড়া খেলার । গল্পের যেখানে সেখানে দেখা দেন তাঁর গুনিয়া ভাই, অর্থাৎ তাঁদের ঠাকুর কাম মেজর ডোমো কাম পারিবারিক অভিভাবক, যিনি নাকি সন্ধ্যা হলেই পাড়ার সব বাচ্চা কাচ্চাকে ধরে ঘরে পাঠান, বেয়াদবি দেখলে উড়িয়া ভাষায়, 'এমিতি মারিবু সব্বকু' বলে দাঁত খিঁচিয়ে ধমক লাগান । পড়ে আমরা হেসে গড়াই, কারণ আমাদের সকলের ছোটবেলায় পরিবারে এমনি এক আধজন অভিভাবক ছিলেন আর যত পড়ি, ততই আমরা ভাবি, তাই তো, আমাদের মতই সাধারণ জীবনের মাঝেই ছিল এই সাহিত্য আর সাহিত্যিকের মেলা, সেখান থেকে তুলে এনেছেন তিনি তাঁর রসে টৈ-টম্বুর গল্পের ঝুলি । সেই জন্যই নবনীতার গল্প পুরোপুরি আমাদের কাছের বাঙালী সমাজের গল্প ।

তাঁর প্রথম যে গল্পটি আমাকে হাসিয়ে এবং ভাবিয়েছিল, সেটি হল তাঁর কলেজ জীবনের চামচিকে পোষার গল্পটই । চামচিকেকে যে শুদ্ধ ভাষায় চর্মচটিকা আর ইংরাজীতে flitter mouse বলা হয়, সেটা নবনীতা প্রথম বলে দিয়েছিলেন । প্রেসিডেন্সি কলেজে তাকে লুকিয়ে নিয়ে দুধ খাওয়াতে গিয়ে মাস্টারমশাই কে বিরক্ত করার সে গল্প পড়লে যে কোন তরুণী একনিঃশ্বাসে তাঁর সাথে একাত্ম হয়ে যাবে । রাধারাণী দেবী যে খেয়ে উঠে পান চিবুতে চিবুতে মেয়ে শাসন করেন, মেয়ে ঠান্ডা লাগাবে বলে গলায় মাফলারের ব্যবস্থা করেন, যত পড়ি তত সাহিত্য আর সাহিত্যিক বাঙালীর ঘরের মাঝে এসে দাঁড়ায় ।

অবশ্য পঞ্চাশ আর ষাটের দশকের দেশ বিদেশের গল্পেই তাঁর ভাঁড়ার শেষ হয়ে যায়নি, কারণ নবনীতার পথ চলা কোথাও থেমে যায় নি । জীবনের একটির থেকে আরেকটি ধাপে তিনি ক্রমাগত উত্তরিত হয়েছেন আর তাঁর উত্তরণের ছাপ নিয়ে ছবি এঁকে গিয়েছে তাঁর কলম । ধাপে ধাপে দুঃখ এসেছে, এসেছে একাকিত্ব, তাঁর ভালবাসার ঘর গেছে ভেঙে । বিষন্নতা ফুটে উঠেছে কবিতার মাঝে —

'এখন তাহলে আমি বিনা প্রতিবাদে
সব অভিযোগগুলিমাথা উঁচু করে মেনে নিয়ে
স্পষ্টত অন্তরশূন্য প্রস্তরফলক হয়ে যাবো ।
আমি আমাদের সব প্রীতিহীনতার পাপ
নিজেই স্বীকার করে নিয়ে, নিজের মন্ডলে সরে যাবো ।

একদা নির্জন রাতে অকস্মাৎ শূন্য আদালতে
বিচারক, বাদীপক্ষ, উকীল কেরানি

একজোটে চায়ের টেবিলে গোল হয়ে, আমাকে একেলা
নিতান্ত নিঃসঙ্গ, নগ্ন, কাঠগড়ায় তুলে
দ্বীপান্তরে ঠেলে দিয়ে, দল বেঁধে
চায়ের মজলিশে ফিরে গেলো ।
যাবজ্জীবন সেই চায়ের আসরে তোমরা বন্দী হয়ে আছো
আমি পাল তুলে, ভেসে ভেসে দ্বীপে চলে যাবো ।

হৃৎপিন্ড কোনোদিন ছিল কি ছিলো না –
কৈফিয়ৎ অদরকারি । সব কিছু পেয়েছিলে, যা কিছু
আমার বুকে ছিলো । বিনা প্রত্যাশায় আমি
নিরাকার প্রিয়মন্যতার পকেট ভরিয়ে নিয়ে
এইবার দ্বীপে চলে যাব ।
সেই দ্বীপে কোনদিন তোমাদের জাহাজ যাবে না ।'

পড়ে কষ্টে আমাদের চোখে জল এসেছে, তাঁর বিষাদে আমাদের মনে ভার জমেছে, তবু আশ্চর্য হয়ে দেখেছি যে নিজের বিষাদ তাঁর কাজের ধারা, তাঁর গতিপথ রুদ্ধ করে রাখেনি বরং তাঁকে যেন আরো অনুপ্রেরিত করেছে। সত্তরের দশকে তিনি তুলনামূলক সাহিত্যের খ্যাতনামা অধ্যাপিকা, অনুপ্রাণিত করছেন অগণিত ছাত্র ছাত্রীদের, দেশে বিদেশে নানান বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণামূলক বক্তৃতা দিচ্ছেন আর লিখছেন অজস্র গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, উপন্যাস । তাঁর জীবনীশক্তি অজস্রধারায় বয়ে যাচ্ছে চারদিকে । তাঁর সাথে ভাব জমে উঠেছে সুনীল, শঙ্খ, শরৎ, শক্তি প্রমুখ তখনকার নতুন লেখক কবি সাহিত্যিক গোষ্ঠীর । শরীর ক্রমশঃ অসুস্থ হয়ে পড়ছে, কিন্তু মন রয়েছে সতেজ সজীব । লেখিকা বাণী বসু স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেছেন স্কটল্যান্ড বেড়াতে গিয়ে তিনি শীতে, বৃষ্টিতে কাতর হয়ে পিছিয়ে পড়ছেন, কিন্তু অসুস্থ নবনীতা লাঠিতে ভর দিয়ে সোৎসাহে এগিয়ে চলেছেন । এই ছিলেন নবনীতা । নিজের জীবনের দুঃখ বেদনা নিয়ে যেমন হাহাকার করেননি, তেমনি খোলা পাতার মত নিজেকে মেলে ধরে জীবনের পথে এগিয়েছেন বরাবর । বেদনা লুকাননি, কিন্তু তিক্ততার আভাসমাত্র নেই কোথাও । তাই তিনি নিজে থেকেই আমাদের কাছে হয়ে দাঁড়িয়েছেন দিশারী ।

সম্প্রতি তাঁকে নিয়ে যে অনেক স্মৃতিচারণ চলেছে, তার একটিতে শুনলাম তাঁর এই সবল বলিষ্ঠ মনোভাবকে একজন সপ্রশংস ভাবে বলছেন 'পুরুষালী' । আমার চোখে তাঁকে পুরুষালী মনে হয়নি কখনও, বরং মনে হয়েছে যে তিনি একান্ত ভাবেই নারী-সহৃদয়তায়, সংবেদনশীলতায়, সহমর্মিতায় কোমল, কিন্তু নন ভঙ্গুর, বেপথুমানা । তিনি নিজেকে নারীবাদী বা ফেমিনিস্ট বলতেন । সে নারীবাদ ৭০ এর দশকের বক্ষাবরণী ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া পুরুষের স্থান কেড়ে নেওয়া নারীবাদ নয় । তাঁর গল্পে কবিতায় নারী নিজেকে নিয়ে কুণ্ঠিত, নয় । সে নিজের সমস্যাকে সমাজের ঠিক করে দেওয়া পরিপ্রেক্ষিতে না দেখে নিজের স্বচ্ছ সহজ বুদ্ধিতে ভেবে দেখে ও নিজের পরিপ্রেক্ষিতে তুলে ধরে । যেমন একদিন তাঁর মা রাধারাণী দেবী প্রমথ চৌধুরীর 'মেয়েদের লেখার মূল্য নেই' এই ধারণাকে ভুল প্রমাণিত করতে অপরাজিতা দেবী নামে কবিতা লিখে নিজের পক্ষ রেখেছিলেন, তেমনি নবনীতা মেয়েদের দৃষ্টিভঙ্গীকে বিনা দ্বিধায় তুলে ধরেছেন । তাঁর বহুল চর্চ্চিত ও প্রশংসিত 'চন্দ্রাবতী রামায়ণ'এর উপর লেখা বইটির নাম এখন অনেকে জানেন । এ গল্প রামায়ণেরই গল্প, কিন্তু এর নায়ক রাম নন, নায়িকা সীতা । সমাজের নিম্ন বর্ণের মেয়েদের গলায় গাওয়া এই কাব্য রামের বীরত্বের কাহিনী বর্ণনা করে না । এ রামায়ণ শোনায় কিশোরী বধূটির বনবাসে কি কি কষ্ট হয়েছিল, কেমন লেগেছিল তার অশোকবনে একলা বন্দী থাকার সময় আর গর্ভিণী অবস্থায় নির্জন অরণ্যে নির্বাসিত হওয়ায় কেমন কেটেছিল তার দিন, কেমন করে একলা সন্তান জন্ম দিয়েছিল সে । এই কাব্যের মাঝে নবনীতা দেখেছিলেন সত্যিকারের নারীর কাহিনী । এই গবেষণা গ্রন্থ তাঁকে এনে দিয়েছিল সম্মান । তিনি

দেখিয়েছিলেন যে পুরুষ কবি যখন রামায়ণের কাহিনী লিখেছেন, তাঁদের লেখনী কেবল রামের বীরত্ব, বনবাস, আদর্শপুত্র, আদর্শ রাজ্যপালন বর্ণনা করে গিয়েছে। রাজকূলবধূ সীতার জীবনের ওঠাপড়া আর তার ব্যথা বেদনা তাঁদের কাহিনীতে গৌণ। সে বেদনা ধরা পড়েছে যুগ যুগান্ত পেরিয়ে মাটির কাছে থাকা সমাজের প্রত্যন্ত প্রান্তের নারীহৃদয়ের সংবেদনায়। তাই শুধু নারীদের নিয়েই তিনি সংগঠন গড়েছিলেন — নাম দিয়েছিলেন 'সই'। একাধারে সহ্য করা, স্বাক্ষর রাখা ও বন্ধু হওয়ার পরিসর। সমকালীন লেখিকা, বান্ধবীদের নিয়ে আরম্ভ করে ইদানীং সে পরিসরে ডেকে এনেছিলেন গ্রাম, গ্রামান্তর থেকে নানা জনজাতির নারীদের, কারণ নারীহৃদয়ের চিন্তাধারা সর্ব কালে সর্বত্র এক।

এমনি করে ৪০-এর দশক থেকে ৫০-এর দশক, ষাট থেকে সত্তরের দশক — দশকের পর দশক পেরিয়ে নানান দেশ, নানান সাহিত্য সমাজের নানা স্তর ছুঁয়ে ছুঁয়ে এগিয়েছেন নবনীতা, সমান ভাবে মিশেছেন, দেখেছেন, বুঝেছেন পুরুষ নারী সবাইকে। তাঁকে দেখতে দেখতে একসময় মনে হয়েছে যে একটি নদী যেন সাগর সঙ্গমের দিকে এগিয়ে চলেছে। কি সে সমুদ্র, তার কোন বর্ণনা তিনি দেন নি। সে কি ঈশ্বর ? সে কি কোন নৈর্ব্যক্তিক চেতনার আস্বাদ ? বোঝা যায় না। তিনি নিজেও খুব স্পষ্ট ধারণা করেননি হয়তো। অন্যান্য বিষয়ের মতো এ ব্যপারেও তিনি বাগ্‌বিন্যাস না করে খোলামেলা ভাবেই বলেন, 'পুজো কেমন করে দিতে হয়, তাই জানিনা। — জীবনে স্বামী সন্তানের জন্য কখনও কোথাও পুজো দিইনি'। তবু হায়দ্রাবাদে সেমিনারে গিয়ে ভ্রমণপিপাসু মনের খেয়ালে হঠাৎ চলে যান এলাহাবাদের কুম্ভ মেলায়। লক্ষ লক্ষ তীর্থযাত্রীদের ভিড়ে মিশে সঙ্গমে তীব্র শীতের রাতে ডুব দিয়ে উঠে অন্যান্যদের দিকে তাকিয়ে তাঁর মনে প্রশ্ন জাগছে, 'কোন আকুল বিশ্বাস তোমাদের ছুটিয়ে নিয়ে চলেছে ? পুনর্জন্ম নিরোধ ? রিবার্থ কন্ট্রোল ? তোমরা প্রত্যেকেই কি ছুটে এসেছ, শুধু এইজন্য, যাতে শীতাতপতাড়িত শোকে উদ্বেগে আন্দোলিত অস্থির নশ্বরতাই তোমাদের শেষবারের দুঃখসুখ হয় ? আর চাওনা ফিরে আসতে ধানসিড়ি নদীটির তীরে, অথবা চৈত্রমাসের শালবনে ?' বোঝা যায় তিনি এ প্রশ্নের উত্তর নিজের জন্য চাইছেন। ভাগ করে নিতে চাইছেন অন্যদের বিশ্বাস, তাই পরের পংক্তিতেই বলছেন, 'ভাগ্যিস আমার কোট আনা হয়নি, তাই তো কম্বলটা জড়িয়ে তোমাদের সাথে মিশে যেতে পারলুম ? মরা-মরা করতে করতে একদিন রামনাম কি বলে ফেলব না ?' পড়তে পড়তে চমকে উঠে ভাবি, তাই তো, নিয়ম কানুন আচার আচরণ আমরা কত না পালন করি ঠেলাঠেলি করে, কিন্তু মনের মধ্যে লেগে থাকে নাকি না বোঝা এক আকুলতা আর বিভ্রান্তির কুয়াশা ?

নবনীতা, আপনি চলে গেছেন। জানিনা আপনার প্রশ্নের উত্তর পেয়েছেন কিনা, পৌঁছেছেন কিনা আপনার কাঙ্খিত সীমানায়। প্রিয় বিচ্ছেদের বেদনা আপনি বহুদিন বহন করেছেন একা একা। বার বার বলেছেন,

'কাছে থাকো, ভয় করছে, মনে হচ্ছে
এ মূহুর্ত বুঝি সত্য নয়, ছুঁয়ে থাকো।
শ্মশানে যেমন থাকে ছুঁয়ে একান্ত স্বজন
এই হাত নাও এই হাত
এই হাত ছুঁয়ে থাকো, যতক্ষণ
কাছাকাছি আছো, অস্পৃষ্ট রেখোনা।
ভয় করে।'

অনুরোধ করেছেন —

'একবার আমার দিকে চোখ তুলে তাকাও
আমি তোমার চোখের মধ্যে একটু হাসি।
সে হাসির আদরে তোমার চোখ কাঁপুক
তোমার চোখ কাঁপুক

তোমার চোখ লাজুক
আমি কাঁপি, আমি কাঁদি আমি দাঁড়াই –' (দ্বন্দ)

প্রিয় সন্নিধানের জন্য আপনার আকুতি দিয়ে শুরু আপনার সেই কবিতাটি শেষ হয়েছে যেন এক প্রার্থনায়। সে প্রার্থনা কি পরম প্রিয় অসীমের কাছে ?

'শ্রাবণের বৃষ্টির মত তাকাও
ভৈরবী স্বপ্নের মত
বৈরাগী মৃত্যুর মত
নিশ্চিত
আর মনে করো তুমি আমার জন্যে
বৃষ্টি আমার জন্যে, বকুল আমার জন্যে, শস্য আমার জন্যে
মনে করো দুঃস্বপ্ন আমার, নৈবেদ্য আমার, চৈতন্য আমার,
আর তখন আমি তোমার হই
তুমি আমার কোলের শিশু হয়ে আমাকে বরণ করো
আমাকে হরণ করো
পূরণ করো।'

আপনি পূর্ণ হোন, পূর্ণ থাকুন নবনীতা।

কৃতজ্ঞতাস্বীকার – বাতায়নের সম্পাদিকা মহোদয়া আমাকে বারেবারে অনুরোধ না করলে ও তাড়া না দিলে এ লেখাটি হয়তো লেখা হত না। কিন্তু না লিখলে গিয়ে প্রিয় লেখিকার জীবন ও রচনাকে ঘুরেফিরে নিবিষ্ট হয়ে পড়ার উদ্যম যে হত না, তা জানি। রঞ্জিতা চট্টোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ। তাঁর উৎসাহে আমি নবনীতা দেবসেনকে নতুন করে খুঁজে পেলাম, বুঝলাম।

দেবীপ্রিয়া রায় – লিখছেন স্কুল ও কলেজের দিন থেকে। পেশায় দর্শন ও তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের অধ্যাপিকা ও গৃহিণী। কাশীর প্রবাসী বাঙালী পরিবারের মেয়ে দেবীপ্রিয়া কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৭৬ সালে ডক্টরেট করে বিবাহসূত্রে সেই বছরেই আমেরিকা এসে শিকাগো শহরে বাসা বাঁধেন। গত ৪০ বছর শিকাগোর বাঙালী ও অবাঙালী সমাজের সাথে নানা ভাবে জড়িয়ে রয়েছেন। সাহিত্য চর্চা দেবীপ্রিয়ার নেশা। শিকাগোর উন্মেষ সাহিত্য গোষ্ঠীর তিনি অন্যতম সদস্য।

প্রণাম ও স্মরণে

সদাহাস্যময় এক উজ্জ্বল তরুণী যেন মঞ্চের ওপর দিয়ে হেঁটে গেলেন ... হাসতে হাসতে, হাত নাড়তে নাড়তে মিলিয়ে গেলেন মঞ্চের অন্যদিকে, উইংসের ধার ঘেঁষে ... যিনি গুরুতর অসুস্থ অবস্থায়, তাঁর স্বভাবসিদ্ধ রসিকতায় ক্যান্সারকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে লিখতে পারেন – "... ভেবেছ আমি ভয় পাবো ? ওসব তো আমার কাছে তুচ্ছ ! আই ডোন্ট কেয়ার কানাকড়ি – জানিস, আমি স্যান্ডো করি !" ... সাহিত্যিক নবনীতা দেবসেন, নিজে কবি পরিচয়ে স্বচ্ছন্দ বোধ করলেও গল্প, উপন্যাস রম্যরচনা, গবেষণামূলক প্রবন্ধ, অনুবাদ, ছোটদের জন্য লেখা – সাহিত্যের প্রতিটা ক্ষেত্রে তাঁর বিচরণ, তাঁর অলৌকিক গদ্যশৈলী (ওনার লেখা সম্পর্কে এ কথা বলেছিলেন ঋতুপর্ণ ঘোষ) ... সবকিছু মিলিয়েই তিনি ছিলেন অনন্যা । প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরের পাঠক ছিল তাঁর গুণমুগ্ধ । তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণাত্মক নবনীতাকে পাওয়া যায় তাঁর প্রবন্ধ, অনুবাদ ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ রচনায়, সেখানেও তিনি অসাধারণ এবং পথপ্রদর্শক ! কবি যশোধরা রায়চৌধুরীর ভাষায় বলতে হয় – "বুদ্ধি-যুক্তি-মেধার করাত দিয়ে যিনি কেটে ফেলতেন অন্ধকারকে ... আমরা আরো একবার নিরাপত্তাহীন হলাম ।"

তিনি বলেছিলেন, আমার যা কিছু কাজ, তা যেন মানুষের ভালোর জন্য হয় ... সত্যিই আজীবন তিনি ছিলেন যুক্তি ও শুভবুদ্ধির পক্ষে ।

এই স্বল্প পরিসরে তাঁর সম্পর্কে কিছু আলোচনা করতে গেলে কিছুই বলা যাবেনা ... তাই এ আলোচনা তোলা থাক পরবর্তী বাতায়ন সংখ্যার জন্য ।

দুঃসংবাদটা পাওয়ার পর মনে হয়েছিল, সময় যেন স্তব্ধ হয়ে গেল, একদিনের জন্য স্থগিতও করা হল কাগজের নৌকার প্রকাশ ... মনে হচ্ছে বড্ড ভুল হয়ে গেল, এক্ষুণি হয়তো নবনীতাদি তাঁর অননুকরণীয় ভঙ্গীতে বলে উঠবেন ... "এতো শোক কিসের ! ... তোমরা তো দেখছি ভুল বিসর্জনের লাইনে দাঁড়িয়ে পড়েছো !"

তাই আজ আর নয় ।

আমরা বিশ্বাস করি, চিরনবীন নবনীতা চিরকালীন হয়ে থাকবেন পাঠকের হৃদয়ে ।

সৌমিত্র চক্রবর্তী

ভালোবাসার এক টুকরো

সাল ২০১৩। মাসটা বোধহয় আগস্ট। খেলার ছলে পত্রিকার তখন সবে হাঁটি হাঁটি পা পা স্টেজ। অফিস আর সংসার কামাই করে দৌড় চলছে তাকে বড় করবার। সেরকমই একদিনে হঠাৎ মনে হল, আচ্ছা নবনীতা দেব সেনের কাছে একবার সদ্যভূমিষ্ঠ ছানাকে নিয়ে গেলে কেমন হয় ? তখনই ইন্টারনেট ঘেঁটে ওনার ল্যান্ডলাইন নম্বর যোগাড় করে সটান ফোন আর কি আশ্চর্য ! ওপারে তিনি স্বয়ং। প্রস্তাব পাড়লাম, "আজই একবার দেখা করতে চাই দিদি"।

"আজ তো হবেনা ভাই। সই-য়ের মিটিং আছে"।

এই রে ! সুযোগ ফসকে যাচ্ছে যে ! অতএব চোখ কান বুজে মিথ্যে বলে ফেললাম, "আজ তাহলে পত্রিকার এক কপি রেখে আসি দিদি। আপনি একটু দেখে রাখবেন"।

আবেদন মঞ্জুর হতেই দুই সম্পাদক মিলে ছুট ছুট, পার্ক স্ট্রিট অক্সফোর্ডে। উদ্দেশ্য নবনীতার বই কিনে তাঁকে দিয়ে বলিয়ে নেওয়া যে খেলার ছলেতে তাঁর একটা গল্প ছাপা যেতে পারে।

ভালোবাসা-য় পৌঁছে বেল বাজাতে ওনার এক বিশ্বস্ত মানুষ দরজা খুললেন। যতদূর মনে আছে নবনীতা তাঁকে কানাই বাবা বলে ডাকতেন।

"কাকে চাই ?"

"দিদি আসতে বলেছেন।"

"আজ ? আজ তো ওনার মিটিং আছে।"

"তবু আসতে বলেছেন।"

"বেশ। তাহলে ভেতরে বসে অপেক্ষা করুন।"

সবে একটা মার দিয়া কেল্লা মার্কা মেজাজ নিয়ে বসেছি, ভদ্রলোক এসে হাজির।

"দিদি ফোনে কথা বলতে চাইছেন আপনার সঙ্গে। আপনি এসেছেন আমি বলেছি।"

এই মেরেছে ! এতো উপকার করতে আবার কে বলল বাপু !

ফোন ধরতেই, "আপনার তো বই রেখে চলে যাওয়ার কথা ছিল। বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়লেন কেন ?"

"মানে ভাবলাম, দেখা করেই যাই।"

"বললাম তো মিটিং আছে।"

"আমরা অপেক্ষা করব দিদি।"

"অনেক দেরি হবে। সন্ধ্যা হয়ে যাবে।"

" আমাদের তাড়া নেই দিদি।"

কয়েক সেকেন্ড চুপচাপ। তারপর, "বেশ, বসে থাকুন তাহলে।"

ব্যস ! আর পায় কে ! গ্যাঁট মেরে এমন বসে রইলাম যে সূয্যি ডুবে গেল, বৃষ্টি নেমে গেল।

অবশেষে তিনি এলেন। নিচ থেকে ডেকে উঠলেন, "কানাই বাবা !"

অমনি তিনতলা থেকে একতলা সিঁড়ি বরাবর একটা কপিকল চালু হয়ে গেল। দেখি, কপিকলের সাহায্যে চলা এক চেয়ারে বসে তিনি উঠে আসছেন। দোতলার স্টেশনে আমাদের দেখে নেমে পড়লেন।

বই দেখে খুব খুশী। নিয়ে যাওয়া ফুল দেখে আরও খুশী। সাগ্রহে নিজের লেখা ছাপানোর অনুমতি দিলেন। লালমাটি প্রকাশনের কর্ণধার নিমাই গড়াইয়ের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন (যে আলাপের সূত্র ধরে নিমাইবাবু আজও এই পত্রিকার প্রচার করে চলেছেন)।

শেষে বললেন, "চা-টা খাও একটু।"

"শুধু চা হলেই চলবে দিদি।"

"সেটা আমি বুঝব", ধমকের স্বরটা নিমেষে বাইরের সন্ধ্যার মতো নরম হয়ে এল, "এটা বাঙালির বাড়ি বুঝেছো ? এখানে চা দিলে সঙ্গে টা-ও দেওয়া হয়।"

তারপর অনেক কথা, অনেক গল্প। শেষে যখন টিপটিপ বৃষ্টির মধ্যে বেরিয়ে আসছি, মনে হল বাইরের আকাশটার মতোই আমাদের মনটাও ভালোবাসার ভালোবাসায় ভিজে একাকার হয়ে আছে। আর যাওয়া হয়নি কোনোদিন। কথাও হয়নি। দরকারই বা কি ? একমাত্র সাক্ষাতেই মনের গভীরে এমন এক মধুর দাগ কেটে দিয়েছেন যে তাঁর চলে যাওয়ার পক্ষেও সে দাগ মোছা তো দূরস্থান, মলিন করাও মুশকিল, যাকে বলে না-মুমকিন।

সৌমিত্র চক্রবর্তী – পেশায় চাটার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট। নিজেকে যতটা সম্ভব আড়ালে রেখে আর্থিকভাবে দুর্বল স্কুল পড়ুয়াদের জন্য কাজ করতে ভালোবাসেন। তাদের জন্যেই ভালোবাসার উপহার 'খেলার ছলে' পত্রিকার মূল কান্ডারি। তাঁর কবিতা, ছোটগল্প ইতিমধ্যেই 'দেশ', শারদীয়া আনন্দবাজার, বা সাপ্তাহিক বর্তমানের মত বহুল প্রচারিত পত্রিকায় জায়গা পেতে শুরু করেছে। এবারেই প্রথম কলম ধরেছেন বাতায়নের পাঠকদের জন্য।

সুজয় দত্ত

মহীরুহ

অনেক ভীড়ের মাঝে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার
বিরল সাহস ছিল তার ।
তাই যখনি উঠেছে ঝড়, আকাশ চিরেছে বিদ্যুৎ,
তারই ভেঙেছে ডাল, ঝলসেছে পাতা
সকলের আগে, তবু নোয়ায়নি মাথা ।
যখনি থেমেছে ঝড় আবার মুকুলে গেছে ভরে ।
প্রতিটি আঘাত তাকে আরো দৃঢ়, আরো ঋজু করে
শিখিয়েছে আজীবন ভয়হীন, দ্বিধাহীন চিতে
পৃথিবীর যত ব্যথা, যত জ্বালা বুক পেতে নিতে ।
ক্ষুদ্র তুচ্ছ কত তৃণলতা তারি আশ্রয়ে
যত্নে উঠেছে বেড়ে, থাকেনি উপেক্ষিত হয়ে ।
কীটেরা বেঁধেছে বাসা, পরাশ্রয়ী আগাছার দল
শুষেছে জীবনরস, পশুপাখী খেয়ে গেছে ফল ।
সয়েছে সে হাসিমুখে, চায়নি কিছুই প্রতিদানে —
শিকড় মাটিতে তবু চোখ তার আকাশের পানে ।
ছায়া দিয়ে, ফল দিয়ে, দিয়ে নির্মল শ্বাসবায়ু
পৃথিবীর মানুষের বাড়িয়ে চলেছে পরমায়ু ।
জানেনা সে এইভাবে নিজেকে বিলিয়ে চলা তার
অচিরেই শেষ হবে — সময় যে বেশী নেই আর ।
এক হাতে কাটারি নিয়ে, অন্যহাতে ‘কৃতজ্ঞ’ করাত,
তার মৃতদেহ বেচে মুনাফায় ফেরাবে বরাত
গরীব কাঠুরে কোনো, কোনো লোভী কাঠের ব্যাপারী ।
স্মৃতি তার রবে কিছু শুকনো টেবিল-আলমারী ।
বিপুলা বসুন্ধরা — সীমাহীন, অনন্ত, অপার —
তবু যে ছোট্ট ভুঁয়ে শিকড় ছড়ানো ছিল তার —
সেটুকু না পেলে আজ থামে বুঝি সভ্যতার রথ !
বন কেটে গড়া হবে শহর-নগর-রাজপথ ।
সেই নগরের পথে কত ভীড়, কত কলরব,
মলিন ব্যানারে লেখা ‘বৃক্ষরোপণ উৎসব’ ।
মানুষের করুণায় অংকুরিত গুটিকয় চারা —
নিঠুর এ পৃথিবীতে বেড়ে উঠে করবে কী তারা ?
ঝড়-জল-দাবানল সব সয়ে একদিন প্রাতে
লুটিয়ে পড়বে ভুঁয়ে মানুষেরই সভ্য করাতে ।

সুজয় দত্ত

জিজ্ঞাসা

ফুল, তুমি কার ?
যে গাছেতে জন্মেছিলে শিশির-ভেজা ভোরের কলি ?
যে মালিটির যত্নে তোমার ফুটল রঙীন পাপড়িগুলি ?
ঐ যে ভ্রমর গুনগুনিয়ে দুইবেলা যায় খবর নিয়ে ?
যে বধূটি আদর করে ঘর সাজালো তোমায় দিয়ে ?
যদি বল তুমি গাছের --
গাছের তুমি দুয়োরাণী,
কত সতীন ডালে ডালে !
ঝরলে তুমি কী আসে যায় ?
ফুটবে হাজার রোজ সকালে ।
ফল ফলাবে, গর্ভে তোমার
বীজগুলি তার করবে ধারণ --
তাই তো তোমায় জন্ম দিল,
নেই কোনো তার অন্য কারণ ।

যদি বল তুমি মালির --
মালির কাছে পণ্য তুমি,
ফুল বেচে সে গাঁয়ের হাটে ।
যেই ছড়ালে রঙের বাহার,
অমনি সে তার ফন্দী আঁটে
বৃন্ত থেকে ছিঁড়ে তোমায়
বাঁধবে তোড়া, গাঁথবে মালা,
সাজিয়ে দেবে বিয়ের বাসর
কিংবা পুজোর বরণডালা ।

যদি বল তুমি ভ্রমরের --
সে আসে-যায় মধুর লোভে,
না পেলে কি ঘেঁষত কাছে ?
এমন তোমার রূপের বাহার --
সেই দিকে তার নজর আছে ?
ছড়িয়ে সুবাস, সাজিয়ে পরাগ,
পথ চেয়ে রও সারাবেলা --
ভাবছ তাকে সাচ্চা প্রেমিক ?
খেলছে সে তো প্রেমের খেলা ।

যদি বল তুমি সেই বধূটির --
আজকে বিয়ের বার্ষিকী তার,
খোঁজ পড়েছে টাটকা ফুলের ।
রাখবে তোমায় ড্রয়িংরুমে,
গুঁজবে তোমায় খোঁপার চুলে ।
এমনিতে তো নকল ফুলের
রমরমা তার কক্ষ জুড়ে --
তার কাছে কী কদর তোমার ?
রাত পোহালেই ফেলবে ছুঁড়ে ।

তবে কি তুমি কারোরই নও ? ভেবে দেখ তো --
তুমি আছো তাই সে আছে,
নামটি যে তার তোমার নামেই ।
তাতেই রাখে ফুল সকলে,
পায় সে শোভা সবার ধামেই ।
বৃন্তচ্যুত ফুলগুলি সে
বাঁচিয়ে রাখে কয়েকটি দিন --
মরবে তুমি তারই কোলে
গন্ধ রেখে তার দেহে লীন ।

বলতে পার কে সে ?

সুজয় দত্ত – ওহায়োর অ্যাক্রন বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিসংখ্যানতত্ত্বের (স্ট্যাটিস্টিক্স) অধ্যাপক। জৈবপরিসংখ্যান বিশ্লেষণতত্ত্বের (বায়োইনফর্মেটিক্স) ওপর ওঁর একাধিক বই আছে। কিন্তু নেশা তাঁর সাহিত্যে। সাহিত্য তাঁর মনের আরাম। গত বারো বছরে আমেরিকার আধ ডজন শহর থেকে প্রকাশিত নানা সাহিত্যপত্রিকায় ও পূজাসংখ্যায় তাঁর বহু গল্প, কবিতা, রম্যরচনা ও অনুবাদ বেরিয়েছে। তিনি ''প্রবাসবন্ধু'' ও ''দুকূল'' পত্রিকা সম্পাদনা ও সহসম্পাদনার কাজও করেছেন।

আশীষ ভট্টাচার্য

প্রিয় অস্ট্রেলিয়া

হঠাৎ আকাশ জুড়ে কোথা থেকে এত কালো মেঘ ?
মেঘ নয়, এটা বুশ-ফায়ার থেকে ফুঁসে ওঠা ধোয়া !
এখানে পাখির ঝাঁকে কাক থেকে কাকাতুয়া বেশি
চুলের রাজত্বে যার নাম ডাক তিনি স্বর্ণকেশী।

এখানে রাস্তা আছে, ফুটপাত কম
গাড়ী আছে কে হাঁটবে ? যদি বেঁধে পায়ে আলপিন
বোট চলে হারবারে, পাল আছে বৈঠা নেই তবু কাঁপে হিয়া
এখানে ডলার মেলে, এ আমার প্রিয় অস্ট্রেলিয়া।

এখানে জন্মিনি ঠিকই, তবু খাটো ভাবিনা কখনো
লকারে সযতনে আছে কেঙ্গারুর ছাপ মারা কারেন্ট পাসপোর্ট
বাড়ি আছে গাড়ী আছে ষাট ইঞ্চি টিভি আছে, বাড়িতে সিনেমা
এয়ার কুলার আছে, এয়ার ফ্রাইয়ার আছে, আর আছে পঞ্চাশটা জামা

সকালে অফিসে যাই, সন্ধ্যা বা রাত্রিতে ফিরি
শনিবার ও মাঝে মধ্যে কাজে যেতে হয়
ইনভেস্টমেন্ট প্রপার্টিটা প্রায়োরিটি, অতিরিক্ত আয় প্রয়োজন
ব্যাঙ্কের একাউন্টে টাকার অঙ্ক দেখে স্বামী স্ত্রীর ভরে যায় মন।

স্ত্রীও চাকুরী করে, ডবল ইনকাম বলে কথা
স্কার্ট প্যান্ট ভেরি স্মার্ট, কে বলবে বরিশালে বাড়ি
গোলাপি নখেতে টেপে আই-ফোন, দোল খায় অফিস চেয়ারে
ছেলেমেয়ে দুইখান কোক খেয়ে বড় হচ্ছে চাইল্ড কেয়ারে

এই ভাবে দিন যাবে জানি
বয়স হবে, বাইপাসও হবে হাসপাতালে
ফাদার্স – মাদার্স ডে তে সন্তানেরা
মেলবোর্ন থেকে আসবে একগুচ্ছ টিউলিপ নিয়া।
এখানে ফুলও মেলে, বড় সুখ, এ আমার প্রিয় অস্ট্রেলিয়া।

আশীষ ভট্টাচার্য – সিডনি নিবাসী । নাটক ও সাহিত্য তার ভালোলাগার জগৎ । নানা পত্রপত্রিকায় নিয়মিত লেখক । মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স থেকে "হ্যালো অস্ট্রেলিয়া" তাঁর সদ্য প্রকাশিত বই ।

শুভ্র দাস

গ্লিসারিন সাবান

উঁচু জানলার ভাঙা কাচ দিয়ে
এক চিলতে রোদ নেমেছে কলঘরের মেঝেয়;
সেই আলো রেখায় শীতকালের সাবান রেখে
অপটিক্স এর প্রথম শিক্ষা –
"ট্রান্সলুসেন্ট মানে কিছুটা দেখা যায়
আবার কিছুটা নয়, আলো-অন্ধকার যেন;
গ্লিসারিন সাবান হাতে নিয়ে দেখো",
বলেছিলেন স্কুলের শিক্ষক।

চৌবাচ্চার ঘন অন্ধকারের পাশে নিজেকে নিয়ে লোফালুফি।
সাবান তখন হাতের মুঠোয় লাল ক্রিকেট বল;
কল থেকে জল পড়ার শব্দে মুখর ইডেন উদ্যান,
ভেসে আসে অজয়দার কণ্ঠস্বর,
"মাঠে হয়তো আপনি নেই কিন্তু মাঠ চলে গেছে আপনার কাছে ।"
সাবান-বল ছুটে যায়
কখনো কপিল দেবের মুঠো থেকে বিপক্ষ খেলোয়াড়ের পাঁজরে,
কখনো বিশ্বনাথের ব্যাটের ছোঁয়ায় এক্কেবারে সীমানার বাইরে।

বন্ধ দরজার পেছনে একান্ত আপনার জগতে
সাবান তখন উত্তমকুমার'এর
মুটোয় ধরা আদ্দিকালের মাইক্রোফোন।
আর জলের সাথে সুরেলা শব্দ ঝরে:
"ও গো কাজল নয়না হরিণী।"
সাবান-মাইক্রোফোনের কারসাজিতে
যমজ নায়িকার মন নিয়ে টানা টানি, উথাল পাথাল।

চুনকাম খসা, ইঁটের দেওয়াল ঘেরা আলো-অন্ধকারে
গ্লিসারিন সাবান কখনো হয় ঘুড়ির লাটাই,
বন বন করে ঘুরন্ত লাট্টু, কল্পনার প্রেমিকের শক্ত পিছল হাত;
অংকের মাস্টারের "পারফেক্ট এলিপস",
দুই আঙুলের ফাঁকে কায়দা করে ধরা জ্বলন্ত তুবড়ি,
রবিবারের ইলিশ কিংবা পৌষের পুলি পিঠে;
কখনো সে ভিড়ের মধ্যে আকর্ষণীয় অচেনা স্পর্শ,

নিজের মনকে, নিজের শরীরকে চেনার নিঃসঙ্গ মুহূর্তে, একমাত্র নীরব সঙ্গী ।
বন্ধ দরজার ওপাশে অবুঝ, অসহিষ্ণু পরিবার
তাড়া দিলে, "আচ্ছা আবার কাল হবে",
বলে ফিরে আসার আশ্রয় ।

কালের ব্যবধানে আশ্রয় বদলে যায়;
এক চিলতে রোদমাখা কলঘর হয় ঝলমলে বাথরুম ।
ক্ষয়িষ্ণু সাবানের মতো ক্ষয়ে যায় কল্পনা,
হাতে পড়ে থাকে শুধু এক টুকরো ফেনামাখা ট্রান্সলুসেন্ট সাবান,
যার ভিতর দিয়ে কিছু দেখা যায় আবার কিছুটা না,
যেমনটা হয় আলো-অন্ধকারে ।

ফিরে যাই চল

ফিরে যাই চল
ওল্ড ক্যাম্পাস নিউ ক্যাম্পাসের দেশে
যেখানে নেহেরু, আজাদ, প্যাটেল থেকে কাকভোরে
ফিতে বাঁধা বুটের ত্রস্ত আগমন
হালকা কুয়াশা ঢাকা স্কলার্স এভিনিউ ছাড়িয়ে
শকুন-তলার মোড়ে; কিংবা
আর. কে., আর. পি., এস. এন. থেকে টুক করে রাস্তা পার –
জীবনের সেই চার মাথার মোড়ে ।

চল ফিরে যাই
এফ ১২৭ এর অবসন্ন একঘেয়ে অপরাহ্ন
থেকে নেতাজির জাগ্রত রাতে,
হাওয়াই ফট ফট, সাইকেল আর রিকশার টুংটাং
শেষে যেখানে দুপুর গড়িয়ে সন্ধ্যা নামে, ক্যানটিনে;
ঘরে বারান্দায় বাতি জ্বলে,
চলে মস্তিষ্কে শান দেওয়া আদান প্রদান ।

যাবি নাকি
রমন ভাটনগর থেকে এস-৩০২ ঘুরে
হসপিটালে, অসুখের অছিলায়;
এনসিসির মাঠে, অবাধ্য, ভাঙা রাইফেল হাতে,
যেখানে মহালয়ার কাকভোরে ঘুম ভাঙে
জিলিপির আঘ্রাণ আর
অনেক বেশী থার্মোডাইনামিক্স-এর আশায় ।

ফিরে যাই চল
যেখানে প্রথম চেনা, ঘর্মাক্ত ওয়ার্কশপের হাতুড়ির শেষে
আবার যেখানে মোগলাই এর হাতছানি;
ডেকে নেই ওদের, জ্বলে থাক বাতি,
থেমে থাকা ঘড়ি বেঁধে হাতে
দিনরাত চলুক মস্তিষ্কে শান দেওয়া আদান প্রদান;
আর সপ্তাহান্তে একবার করে আসুক, ঘরে ফেরার ডাক ।

শুভ্র দাস – গত তেইশ বছর ডেট্রয়ট, মিশিগান নিবাসী । পেশায় মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ারং-এর প্রফেসর । জন্ম ও ছোটবেলা কেটেছে হাওড়ায় । পড়াশোনা খড়গপুর আই. আই. টি ও আইওয়া স্টেট ইউনিভার্সিটিতে । নেশার মধ্যে ছবি তোলা ও ছবি আঁকা, লেখা লেখি, ঘুরে বেড়ানো, নাটক ও পলিটিক্স । বর্তমানে রেসিস্টেন্স মুভমেন্টে অনেক সময় কাটছে ।

তাপস কুমার রায়

মন ভাসে না

মাঝে মাঝে হঠাৎ কালো করে আসে দিন
আকাশ ঝুঁকে পড়ে মাধবী লতার মতো
মনের ভেতর আঁচড় কাটে কে ও
বাবলা কাঁটায়
ঢাকে পুরনো ক্ষত আলগোছে মলম লাগায়।

এইসব দিনে হঠাৎ জানালায় দাঁড়ালে
ভো-কাটা ঘুড়ির ন্যায় প্রেম উড়ে এসে বসে।

এমনিতে এখন মন ভাসেনা যখন তখন
জ্যোৎস্না রাতে চাঁদ ঘাড়ে এসে বসলেও না;
এই মাঝবয়সে প্রেমের আগে দর্শন উপনীত হয়।

রাতজাগা চোখে ইদানিং বর্ষা এলে জানালায়
আমাকে একা রেখে, – কিশোরী শহর ভেজে রাস্তায়।

তাপস কুমার রায় – যুক্তরাষ্ট্র সরকারে অর্থনীতির গবেষক তাপস কুমার রায় প্রাথমিকভাবে একজন চিত্রশিল্পী। কনেক্টিকাট বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাথরিন মায়ারের কাছ থেকে ফাইন আর্টস প্রশিক্ষণ লাভ করেন। তাপসের লেখায় ধরা পড়ে প্রবাস-এর একাকীত্ব এবং বাজারি সভ্যতায় তার বিপণ্নতা। তার লেখা পূর্বে দেশ বা দুকুল-এর মত আন্তর্জাতিক বাংলা ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয়েছে এবং এছাড়াও বাঙালি চলচ্চিত্র গান হয়েছে। 'ঘর খোঁজা সন্ধ্যারা' তাঁর প্রথম প্রকাশিত কবিতা সংগ্রহ।

স্বর্ভানু সান্যাল

স্মৃতি

তোমার অঙ্গশোভা চোখের কাজল
জমা মুসাফির ব্যথা। কথা কলরোল।
আশ্রয় খুঁজেছি আমি। শতাব্দী প্রাচীন
পথে পথে ঘুরে আজ সন্ধ্যা আসীন।

জল নাকি পুরাতন স্মৃতি ধরে রাখে...
তোমার কান্না সে কি খুঁজেছে আমাকে ?

স্বর্ভানু সান্যাল – কর্মজীবনে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার। চাকরিসূত্রে আমেরিকার শিকাগোয় কর্মরত। পেশাদারি এবং পারিবারিক জীবন বাদ দিলে, তার অনেকটা সময় কাটে সাহিত্যচর্চা করে। অনুগল্প, রম্যরচনা, কবিতা, স্মৃতিকথা নিয়মিত লিখে থাকেন। ''যযাতির ঝুলি'' (https://jojatirjhuli.net) নামে তার ব্যক্তিগত ব্লগ আছে এবং সেই ব্লগ এর মাধ্যমে তার লেখা নিয়মিত পাঠকদের সাথে ভাগ করে নেন। ব্লগটি বেশ জনপ্রিয় এবং সেটির সাথে লিঙ্কড একটি ফেসবুক পেজও আছে (https://www.facebook.com/jojatirjhuli)। অন্য শখের মধ্যে আছে বেড়ানো, ফটোগ্রাফি, গান শোনা। আর অবশ্যই কারণে অকারণে একটু গড়িয়ে নেওয়া।

অনুদিত কবিতা

Vicente Aleixandre

Nude

(I)

What are you carrying there
In your elegant basket of graceful daisies?
The untainted setting sun yearns to
kiss me from your unblemished cheeks.
A glowing bodice enfolds the
tender glory of captive noon.
While your throat held high sustains the thick-set tresses of light
Above which virgin birds burst into flame.

Put down your elegant basket, set it down,
that magic messenger from the fields;
lie down by the by the river's edge
here on grass.
And let me whisper in your
ear my dark despair,
My penumbral hope beneath the silver poplar trees.

উদ্দালক ভরদ্বাজ

নগ্ন

(১)

কোন ফুল তুলেছ তুমি?
তোমার সহজ ডালিতে, শিউলি?
নিষ্পাপ বিকেলের রোদ
তোমার নিখুঁত গালের থেকে উঠে
আমাকে চুমু খেতে চাইছে, অবিরল।
স্বচ্ছ আলোর মত আলতো শেমিজ
যেন আগলে রয়েছে কোমল কোরক দুটি,
রক্ত-রঙ দিনান্ত-আকাশের সহজ গৌরবে,
যৌথ স্বপ্নের গরিমায়।
সম্রাজ্ঞীর মত উঁচু গলা, ঘন চুল, যেন
জমাট আলোকপুঞ্জ, মেঘের বারান্দায়;
কুমারী পাখিরা উড়ে এসে বসবে এখনি,
উন্মুখ ডানার আগুন,
চঞ্চল, আনমনা ভুলে,
মাতবে সৃষ্টির আকাশ,
দ্ব্যর্থহীন কামনায়।

নামিয়ে রাখ পুষ্প স্তবক তোমার।
নদীতীর, ঘাসের এই গালিচায়
এলিয়ে দাও নরম শরীর,
আর আমাকে বলতে দাও
তোমার গোপন ইচ্ছার কানে,
আমার যন্ত্রণার কথা;
আমার গগনচুম্বী প্রত্যাশার কথা
আকাশমণির এই নির্জন ছায়ায় –
তোমার সপ্তপর্ণী অস্তিত্বের

এম ডি এন্ডারসন ক্যান্সার সেন্টার-এ ক্যান্সার বিষয়ে গবেষণায় রত **উদ্দালক** অবসরে কবিতা পড়া, লেখা এবং অনুবাদ নিয়ে থাকতে ভালবাসেন। উদ্দালকের কবিতা এবং অনুবাদ, কলকাতা এবং আমেরিকার বিভিন্ন পত্রিকা যেমন প্রবাস বন্ধু, দুকূল, প্রথম আলো, ভাষাবন্ধন, অর্কিড, বাতায়ন ইত্যাদিতে ছাপা হয়েছে। কবিতার বিষয় মূলত প্রেম হলেও, জীবনের আরও নানান উপলব্ধির প্রতিক্রিয়ায়ও উদ্দালক প্রকাশ করে রাখেন তার অনুভব। কখনো তা কবিতা হয়, কখনো শুধুই স্বগতোক্তি। সম্প্রতি নিউ জার্সির আনন্দ মন্দির প্রদত্ত গায়ত্রী স্মৃতি পুরস্কারে সম্মানিত হন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত তার সাহিত্যকর্মের উৎকর্ষতার জন্যে। স্ত্রী নীতি ও পুত্র সায়ন-কে নিয়ে উদ্দালক টেক্সাসের হিউস্টন শহরে থাকেন।

(II)

Bring close your naked feet,
Thrust them in water.
A swirl of gold, of crimson,
of fleeting silver
Sweeps across the sky,
confronting all its resistant radiance
With your unchanging foam,
o rose.
Let me now drink that crystal water
And perhaps blindly kiss
Some new blossomed petasl,
a tall straight stem
A perfume steeped in spring,
While overhead your comely body airs
Its shining tresses and
your two hands laugh
Amidst its light, and
your bosom throbs.

(২)

তোমার দুটি পা, মেলে দাও,
জলের ওপর, আলগোছে;
ওদের সোনার স্পর্শে, জ্বলুক আগুন-রঙ্গা ভোর,
রুপোলী নগ্নতার তাপে, ক্ষুরধার সময়
অসামান্য তির্যক রঙে –
ঘুরে যাক আকাশ-সীমায়।
গোলাপি সাধের বীজ
ছড়াক আঘ্রাণে, তার তীক্ষ্ণ নির্জন প্রভা;
বিন্দুতে বিন্দুতে জাগুক,
ফেনার নরমে ওরা, আমার স্বপ্নের মত,
তোমার নরম পায়ের অসামান্য মুগ্ধতায় !
ও গোলাপ, গোলাপ আমার...
পান করতে দাও আমায় সেই জল,
মিটুক তৃষ্ণার সাধ, স্ফটিক ফোয়ারায়।
অধীর চুম্বনে মুছে নিতে দাও,
ওই নগ্ন পদ্মের পাতা,
উদ্ভিন্ন, ডাগর ডাঁটি, সতেজ শুভ্রতা,
আগ্রহে, অস্থিরতায়, অসহ্য আবেগে –
বসন্ত ঘ্রাণে, অঘ্রাণ মায়ায়...
মাথার ওপরে জেগে থাকুক তোমার
পালক শরীর, মেঘছায়া চুল,
জল-ছোঁয়া হাল্কা হাতের হাসি,
আর হাসির দমকে কেঁপে কেঁপে ওঠা
তোমার নরম বুকের ইঙ্গিত
ঢেউয়ে, জলে, আবছা ইশারায় !

(III)

Your wet naked figure
has no fear of light.
All the landscape's green
becomes more tender
In the presence of your
outstretched body.
On your wakeful breast, a trilling bird
Comes to offer its song,
and swells in pride.
Atop that height, its full ecstatic voice
Sings to the light and
feels your tender warmth
disseminate him.
He looks a moment at the tepid
plain still humid with dew
And with his slow amorous beak he drinks,
Drinks the pearly brightness
of your flesh,
Raising toward the sky
his feathered throat,
Drunk with love, with light,
with radiance, with melody.

(৩)

তোমার জলে ভেজা শরীর,
আলোর তীক্ষ্ণতাকে ভয় পায় না।
নদীতীরের বনানী, আরও ঘন –
সবুজ মসৃণতায় ভরে ওঠে,
তোমার প্রত্যক্ষ শরীরের পাশে।
তোমার উৎকীর্ণ স্তনের সৌধে এসে
বসে এক অনামা পাখি,
তোমায় অর্পণ করতে চায় তার গানের অর্ঘ্য।
অদ্ভুত গর্বে স্ফীত তার একাকীত্ব
তখন নির্দ্বিধায় ডুবতে চায়
তোমার নির্জন শরীর অরণ্যে।
সেই উত্তুঙ্গ চুড়ায়,
প্রাণের গানে, ছুঁয়ে ফেলে আলোর পরিখা,
সেই পাখি, নিশ্চুপ মেধায় দেখে,
একটু একটু করে, তোমার শরীরের ওম,
কেমন গলিয়ে ফেলছে তার বিষণ্ণ সত্ত্বার হিম।
নিস্পলক, তাকায় এক বার
এখনো শিশিরে আর্দ্র,
সেই উষ্ণ পেলবতার দিকে,
আর উদগ্রীব স্পৃহার ঠোঁটে,
একটু একটু করে শুষে নেয়
সেই গোলাপি সৌধের আলোর নম্রতা।
আকণ্ঠ সুরায় মগ্ন, মত্ত সেই মন-ভরা পাখি
ভরে ওঠে নিজেও; অনন্ত আলোয়,
শুভ্রতায়, গানে।

(IV)

Behold your naked body turn to light,
Still wet with moisture of the day,
Upon the tranquil meadow in the magic atmosphere of love
With my finger
I have traced upon your flesh
Some sad words of farewell.
Your velutinous breast
silences my last caress:
Your heart has almost seized to beat.
In your throat a melody falls still,
Mute lamentation of the
panting western wind,
And if I look at you I see the light,
the dying light,
Now drained of blood,
expiring in a final cry
before my eyes, blinded.

Suddenly I plunge into your mouth
And drink there all the last
death rattle of the night

(৪)

দেখ কেমন করে আঁধারে বর্তায় তোমার
নগ্ন নির্জন শরীর। এখনো সিক্ত রসে,
বেদনার, আকাঙ্ক্ষার, ভয়ের ঘামে;
দিনের আলোড়নের নিশ্বাস
রাত্রির গভীরে ঢালে কামনার রঙ ।
আদিগন্ত ছড়ানো শান্তির ঘাসজমি
ভরে ওঠে প্রেমের পুণ্যের গানে।
আমার আঙুল ততক্ষণে এঁকেছে বিরহের ছবি
তোমার শরীর ইজেলে,
কিছু শব্দ বিদায়ী সান্ত্বনার ছলে।
অথচ তোমার বুকের মসৃণ রোমকূপ,
জেগে উঠে রুখেছে আমার অন্তিম সোহাগ।
যেন শ্বাস টুকুও নেবে না তুমি আর, তবুও
গলায় গুনগুন গানের সুর এক,
ঝরে পড়ে অবুঝ জ্যোৎস্নায়।
যেন দীর্ঘশ্বাস কারো, হয়ত হাওয়ার!
অথচ তোমার দিকে তাকালে আবার একটা
আলো দেখতে পাচ্ছি আমি।
মৃত আলো,
শব্দহীন, অনুযোগহীন; রক্তহীন।
চোখের সামনে শেষবার চিৎকারে
আকাশ ভরিয়ে চলে গেল
আমাকে অন্ধ করে।

হাতড়াতে হাতড়াতে আমি
হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ে শুষে নিই,
তোমার বিহ্বল ঠোঁটের আঁধার ছেনে
মরণোন্মুখ রাত্রির নাভিশ্বাসটুকুও।

Translated from original Spanish to English by Hugh A. Harter

বাংলা অনুবাদঃ উদ্দালক ভরদ্বাজ

১৯৭৭ সালে, স্প্যানিশ ভাষার কবি ভিসেন্তে আলেইক্সান্দ্রে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পান তাঁর সৃজনশীল কাব্যিক রচনার দ্বারা এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে এবং আধুনিক সমাজে মানুষের সঠিক অবস্থানের ওপর আলোকপাত এবং স্প্যানিশ কবিতার ঐতিহ্যের পুনরুত্থানের জন্যে। Nude (El desnudo) কবিতাটি, ১৯৬৬ সালে প্রথম প্রকাশিত তাঁর Sombra del Paraiso গ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদ Shadow of Paradise (১৯৮৬) নেওয়া হয়েছে।

তপনজ্যোতি মিত্র

৩) অনন্ত শরশয্যায় শুয়ে থাকো তুমি

অনন্ত শরশয্যায় শুয়ে থাকো তুমি
চোখ থেকে ঝরে পড়ে অশ্রু জল
তোমার স্বজন, স্বদেশ তোমাকে পরিত্যাগ করে গেছে
বিষণ্নবেলায় কেউ তোমার সঙ্গী হয়নি
মহারণশেষে তুমি আহত, ক্লান্ত, যুদ্ধক্ষেত্রের একাকী জীবিত সৈনিক
তোমার মুখে পিপাসার জল ধরার কেউ নেই
প্রেমহীন গাঢ় কুয়াশা তোমাকে ঘিরে থাকে, দীনতায় করে আচ্ছন্ন

তবু তুমি ছেড়ে যাওনি তোমার করুণাময় পৃথিবী,
রক্তপাতের হাহাকার, বৃষ্টিপ্লাবিত রাত্রি

জীবনমৃত্যুর শেষমুহূর্তগুলিতেও তুমি স্বপ্ন দেখো
যুদ্ধহীন উজ্জ্বল সমাজ
সবুজ শস্যক্ষেত্র
আলোকিত মাঠ

তোমার মায়াবী পৃথিবী তোমার রক্তক্ষরণের ক্ষতগুলি তখন অসীম মমতায় ধুইয়ে দেয়

৪) আলোকমালা পেরিয়ে আসো তুমি

আলোকমালা পেরিয়ে আসো তুমি
শুদ্ধতম কবিতার শব্দাবলী তোমার স্মৃতিতে এসে দাঁড়ায়
দিগন্তবিস্তৃত সমুদ্রের বালিয়াড়ি থেকে তুমি কুড়িয়ে নিয়েছো ঝিনুক
তোমার স্মৃতির মধ্যে জেগে থাকে দীর্ঘ পাহাড়ের শীর্ষ থেকে দেখা অপরূপ ভোরের পৃথিবী
তুমি বালকের মত সারল্যে জনপদের রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাও
একটি নিষ্পাপ দেবশিশুর স্বর্গসম চোখে তুমি দেখো জীবনের উজ্জ্বলতম আলোককবিতাগুচ্ছ

কাকে উপহার দাও তুমি তোমার শব্দ আর নৈঃশব্দের অনুভূতিমালা ?
ভাঙা মানুষের শীত সরিয়ে আনো বসন্তের সুন্দরতম গান ?
পাহাড়ি নদীর কলরোলভরা দুরন্ত জলযাত্রা ?

মায়াবী পৃথিবী, সুখদুঃখের পৃথিবী, বসন্তপৃথিবী তাদের সকলের জন্যে অপেক্ষা করে

তপনজ্যোতি মিত্র – সিডনির বাসিন্দা, পেশায় আই. টি. । কাজের শেষে প্রতিদিন বইয়ের জগতে ফিরে যান । রবীন্দ্রনাথ/জীবনানন্দ সহ বিভিন্ন লেখকের লেখা পড়ার মাঝে কখনো সখনো নিজেরও দু-এক লাইন লেখার বিনীত প্রয়াস । একটি গল্প 'বসন্তের জলাশয়ে প্রতিচ্ছবি' দখিনা পত্রিকায় প্রকাশিত । কবিতা আবৃত্তি ও গল্প পাঠের বাচনিক শিল্প করতে ভালবাসেন । এবং কখনো নাটকে অভিনয়, কখনো বা দেশ ভ্রমণ ।

সঞ্জয় চক্রবর্তী

মফঃস্বলের লেখা

দুপুর রোদের ধুলো,
কিছু হাওয়ায় উড়েছিল,
(যখন) তাপের দহন জ্বালায় ধিকি ধিকি,

তখন তোমায় ভেবে ফেলে,
সে এক মফঃস্বলের ছেলে,
বিকেলে দেখো বৃষ্টি নামায় ঠিকই ।

শেষে টিনের চালের পরে,
অঝোর কালবোশেখি ঝড়ে,
পড়ছি ঝরে বুকের আশেপাশে,

ভিজি শহরতলি জুড়ে,
তোমার শহর থেকে দুরে,
মন ভেজানো ভাবনা ঘিরে আসে ।

সে সব অবুঝ মাখা দিনে,
কলেজ কামাই, ক্যান্টিনে
মুখোমুখি, দোপাট্টা চুড়িদারে
যেন আনার থেকে কলি,
আমিও রাজার মত চলি,
চুটকিতে মেঘ ছড়াই গলির ধারে ।

তবু শালিখ চড়ুই ডানা,
আমার ডোবার কচুরিপানা,
দাগায়নি তোমার শহরপানা মনে,

ছিলে ব্যস্ত সময় সাথে,
তাই একলা ঝিঁ ঝিঁ রাতে,
কাঁচের মত ভাঙ্গছি ঘরের কোণে ।

এখন নতুন রকম সুখে,
আছো দিব্বি ফেসবুকে,
বিদেশ টিদেশ হরেক কিসিম ছবি,

তবু রোদ বৃষ্টি শেষে,
মনের সালোকসংশ্লেষে,
(আজও) ভাবছে তোমায় মফঃস্বলের কবি ।।

সঞ্জয় চক্রবর্তী – অধুনা সিডনী নিবাসী । পেশায় সিভিল ইঞ্জিনিয়ার কিন্তু নেশায় আদ্যন্ত কবিতাপ্রেমিক । ছন্দ তার কবিতায় প্রাধান্য পেয়ে থাকে । ফেসবুকিয় জগতে অনেক দিন ধরে টুকিটাকি লেখার পর অবশেষে বাতায়নে আত্মপ্রকাশ । সঞ্জয়ের সব থেকে বড় দুর্বলতা হল মেঘ আর বৃষ্টি ।

মানস ঘোষ

কবি ও সম্পাদক

কবি

একটা কবিতা পড়লে।
দুটো কবিতা পড়লে।
ভালো লাগলো।
কবিতায় মগ্ন হলে, আঁকড়ে ধরলে,
কবিতার সবুজে ক্রমাগত হারিয়ে যাওয়া,
কখনো বা নীলে ভেসে গেলে,
কবিতার ধুলোভরা মাঠে শিশুর মতো
মনের আনন্দে গড়াগড়ি খেলে ।
ধুলো মেখে উঠে এসেছ . . . .
পোশাক থেকে ঝরে ঝরে পড়ছে
একটা একটা শব্দ, ছন্দ, চিত্রকল্প . . . .
নির্জনবাস সম্পূর্ণ হলে
গলার কাছে দলা পাকানো কষ্টগুলো
ভাষা পেলো ।
একটা কবিতা লিখলে,
দুটো কবিতা লিখলে . . . .

সম্পাদক

সম্পাদনার কাজটাই এরকম,
স্যাকরার মতন . . . .
সারাদিন টুক টুক ঠুক ঠুক করে সোনার গায়ে . . . .
সোনা ধরিয়ে, সোনার গা থেকে সোনা ঝরিয়ে,
বনেদী আলপনায় ফুটিয়ে তোলা . . . .
অলঙ্কারের চিত্রকল্প।
পেলব আর মসৃণ
মসৃণ আর নিখুঁত
নিখুঁত আর ঝলমলে
বালা, হার, চুড়ির যথাযথ শৃঙ্খল।
তাই . . . .
সম্পাদকরা কখনো কবি হতে পারে না,
যতক্ষণ না একটা ভারী হাতুড়ির ঘায়ে
তছনছ হয়ে যায় বন্ধনের নিপুণ সৌকর্য।

মানস ঘোষ – মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ডিপ্লোমা করার পর, বেছে নেন, সমস্ত আবেগ, ভাবালুতা আর ব্যক্তিগত পরিসরকে তছনছ করে দেওয়ার মতো ঝুঁকিপূর্ণ এক পেশা, ভারতীয় রেলের ''ট্রেনচালক'' । এই গ্রহে উনিই প্রথম ট্রেনচালক যার একটি বাংলা কবিতার বই প্রকাশিত হয়েছে। জীবিকা যাপন ও প্যাশনের এই পাহাড়প্রমাণ বৈপরীত্যের যন্ত্রণা কখনো তাঁকে স্তব্ধ করেছে, কখনো আবার আলোকিত বর্ণমালা নিয়ে হাজির হয়েছেন খোলা 'বাতায়ন' পাশে, আমাদের মাঝে।

পারিজাত ব্যানার্জী

কবিতা সিরিজ

কয়ামত আর যুদ্ধবন্দী প্রেম

১) মৃতপ্রায় সেনানি

উফ, বড় যাতনা গো মননে –
কেউ কি আছো, যে একটু জল এনে দেবে ঠোঁটের গভীরে যতনে ?

জানি, পথ হয়েছে শেষ – উপস্থিত সেই মোক্ষম অবস্থান –
তবে কেন এত আঁধার চারপাশে – অপেক্ষায় বিমূঢ় মহানির্বাণ !

কোথায় আমার স্বর্ণখচিত রথের চাকার ধ্বনি –
স্বর্গদ্বার কি হল উন্মোচিত, প্রেয়সী, দেখি তব মুখখানি !

এই জন্মের ঘোর লেগে থাকে যেন আগামী জন্মের ডোরে –
আবার তোমার চুম্বনেই প্রারম্ভ – এবার তবে বিদায় দাও মোরে !

২) উদ্বেলিত ঘরণী

ওই, ওই শোনো সই, এতক্ষণে নাভিশ্বাস উঠল বোধহয় –
এবারকার মতো গল্প তবে শেষ – লেখা থাক তবু অন্তিম অক্ষরদ্বয় !

বাইরে দেখো, কেমন উল্লাসে মেতেছে শত্রুপক্ষের সেনানী –
ওদের কুটীরও তো আঁধারাবৃত, ভালে সিঁদুর তোলেনা ঘরণী !

রাজারাজড়ায় জড়াজড়ি করে পাড় হয়ে গেল ভবিষ্যৎ –
পূর্ণতার অপ্রাপ্তকালে প্রেম তবু লুক্কায়িত যুগপৎ !

না, এ শোকের থান গায়ে জড়াবো না আজ আর আমি,
যুগ্মিত হৃদয়ের মৃত্যু ঘটবে যবে, তবে সাড়া দেবে শূলপাণি !

পারিজাত ব্যানার্জী – জন্ম ধানবাদে হলেও লেখিকার আদ্যপ্রান্ত বেড়ে ওঠা কলকাতায়। বিবিএ, এমবিএ পাশ করে টানা আট বছর কলকাতায় রিয়াল এস্টেটে চাকরি করলেও বরাবরই লেখালেখিতেই তাঁর প্রধান ঝোঁক। ইতিমধ্যেই কলকাতায় প্রকাশিত হয়েছে ছোটগল্প, উপন্যাস এবং কবিতা সংকলন মিলিয়ে তাঁর পাঁচ পাঁচটি বই। এছাড়াও বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে তাঁর আরও বেশ কিছু লেখা। প্রথম পুরস্কার পেয়ে সম্মানিত হয়েছেন অধ্যাপক কবি আব্দুর রসিদ চৌধুরীর স্মরণ প্রতিযোগিতায়। বর্তমানে স্বামী সুমিতাভ'র সাথে তিনি অস্ট্রেলিয়ার সিডনি শহরে বাস করছেন কর্মসূত্রে।

সৌমিক ঘোষ

কবি ও প্রেমিকা

ও বলল, কবিতা লেখ এমন..
আমি বললাম, আমিতো কবি নই..
ও বলল বৃষ্টি নামাতে হবে
আজ মেঘলায় আমরাই জলসই !

ও বলল একটা জোনাক জ্বলে..
আমি বললাম নিতেই পারিস ধরে
তখন সন্ধে কাঁঠাল গাছের তলায়
রাত্রি নামছে আমায় তোকে ঘিরে

আকাশ ভরে হঠাৎ জোনাক পোকা
ঘাসের ওপর নামল বিন্দু হিম
তখন তোর বয়স এলোমেলো
আমার মাথায় কবিতা রিমঝিম

ও বলল তোর কি কাজ তবে
আমি বললাম আমার স্বপ্নদোষ,
ও বলল দিলেই পারিস ছেড়ে
ফেলে দিলাম মাথার শব্দকোষ

তারপর সেই তেপান্তরের মাঠ
তারপর সেই খড় ও কুটোর দেশ
পেরিয়ে এলাম এক্কেবারে একা
শব্দবিহীন কাব্য অবশেষ ।

হঠাৎ জোরে বৃষ্টি নামল সেদিন
হঠাৎ যেন কন্যা এলো ফিরে
আবার সেই তেপান্তরের মাঠ
নামলো তখন কবিতা ঝিরঝিরে..

সৌমিক ঘোষ – সিডনী নিবাসী তরুণ এই ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারটি পেশাগত ব্যস্ততার ফাঁকেও খুঁজে নিয়েছেন, নিজের জন্য এক অন্য আকাশ, অন্য পরিচয় . . . গীতিকার ও নাট্যকর্মী । তাঁর কবিতাতেও তাই গীতিময়তার আভাস, নাটকের দৃশ্যমানতা। প্রথম প্রকাশ সাঁঝবাতি পত্রিকায় ২০০১সালে ।

ইন্দ্রাণী দত্ত

প্রাণগোপাল

রাস্তার আলো সামান্য ত্যারছা হয়ে লিপির শরীরে পড়েছে; ওর লম্বা ছায়া সরু গলির ওদিকের ফুটপাথ পর্যন্ত নিতান্ত অদরকারি ভাঙাচোরা এক সাঁকো তৈরি করেছে তার ফলে। এখন গভীর রাতে বড় রাস্তায় গাড়ির আওয়াজ প্রায় নেই। একটা দুটো হেডলাইট লেভেল ক্রসিং পেরিয়ে ওদের পাড়ার দিকে আসছে; সে আলোয়, ছায়ার সাঁকো ভেঙে গিয়ে নদী হয়ে যাচ্ছে, তারপর আবার জুড়ছে, ভাঙছে, আবার জুড়ে যাচ্ছে। মাঘের হাওয়া লিপির মুখের বাঁদিক কেটে নিলেও ছায়া নির্বিকার । ফলে লিপির নিজেকে আরো একা লাগছে। লিপি দাঁড়িয়ে আছে বাড়ির সামনে, যে বাড়িতে গোপাল, অনিমেষ আর সে ছিল গতপরশু অবধি। এই মুহূর্তে বাড়িতে কেবল লিপি আর গোপালের খাঁচা, অনিমেষ ট্যুরে, আজ ফিরবে। অনিমেষ এখনও শূন্য খাঁচার কথা জানে না। ট্রেনের হুইশল কানে এল লিপির। চাদর দিয়ে আরও ঘন করে কান, মুখ ঢাকল, তারপর নিজেকে নিজেই আঁকড়ে ধরল দু'হাতে দুই কনুই ছুঁয়ে।

ফুলশয্যায় অনিমেষ নিজেকে ইন্ট্রোভার্ট বলেছিল প্রথমে। নিজেকে রাগী বলেছিল; ওর তেমন কোনো বন্ধু নেই, বলেছিল সে কথাও। তারপর লিপিকে গোপালের কথা বিশদে বলে। বস্তুত, লিপির বাবার ক্যান্সার ধরা পড়ার দুমাসের মধ্যে, তাড়াহুড়োয় সম্বন্ধ করে বিয়ে; অনিমেষের মামার বাড়িতে বৌভাত, ফুলশয্যা। নিমন্ত্রিত আত্মীয়স্বজন চলে গেলে, ফুল সাজানো খাটে বসে অনিমেষ বলেছিল – 'গোপালের কথা তোমার জানা দরকার। গোপাল আমার প্রাণ। আর আমার কেউ নেই।'

ফুলশয্যায় কেঁদে ফেলেছিল অনিমেষ ।

– 'ছোটোবেলায় মা বাবাকে মরে যেতে দেখেছি; মরতে আমার বড় ভয় লিপি।'

রজনীগন্ধা এবং গোলাপের গন্ধ ছিল ঘর জুড়ে। লিপি অনিমেষকে দেখছিল; ছোটোখাটো নিরীহ মানুষ, মাথার সামনে টাকের আভাস; আঙুলে গ্রহরত্নের আংটি – দু চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছে। এক অস্পষ্ট আকারবিহীন মায়া ক্রমে ঘন হয়ে উঠেছিল তারপর আচমকা ঘাই দিয়েছিল লিপির বুকে। এই প্রথম, সে তার নতুন বরের হাত ধরেছিল; গত দু'মাসে শোনা আপ্তবাক্যগুলি আউড়ে গিয়েছিল একে একে। প্রথমে বলেছিল – 'জন্মিলে মরিতে হবে'। তারপর আবার গলা খাঁকরে বলেছিল – 'সেই গল্প জানো তো ? এক মুঠো সর্ষে দানার গল্প ?' তারপর থেমে গিয়ে আর কী বলবে ভাবতে বসেছিল।

অনিমেষ কথা বলছিল অনর্গল – 'ছোটোবেলা থেকে এই রকম ভয় আমার। তুমি হাসবে শুনলে। একবার তো বুদ্ধদেবের মত তপস্যা করব ভেবে বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছিলাম। ছোটোমামা অনেক খুঁজে ফিরিয়ে আনে। মামাবাড়িতে ছিল গোপাল। বিশাল কুকুর। সে মারা গেলে আর এক গোপাল এনেছিল মামা মামী। এক রং, এক চেহারা। আমার গোপাল ওদেরই ছেলের ছেলে।'

লিপির সামান্য গুলিয়ে যাচ্ছিল, বলেছিল – 'সবার নাম গোপাল ?'

– বড়মামা বলত, 'গোপাল অমর। এক গোপাল গেলে অন্য গোপাল আসবে .... এই কথাটায় বড্ড ভরসা হয়েছিল আমার। জানো লিপি ? রূপকথায় সেই প্রাণভোমরার গল্প আছে না ? ভাবতাম, আমার প্রাণ যেন গোপালের মধ্যে। এক গোপাল গেলে অন্য গোপাল – আমিও মরব না কোনোদিন – এই ভাবে –'

– 'তুমি কী গো! এখনও এরকম ভাবো ?'

অনিমেষ কেঁপে উঠেছিল।

– 'বড় ভয় করে। রাত হলেই মৃত্যুভয় – সে যে কী আতঙ্ক। অন্ধকার হলেই ....', আবার ফোঁপাচ্ছিল অনিমেষ।

– 'এবার থেকে আর হবে না, দেখো।'

লিপি বাতি নিভিয়ে দিয়েছিল।

পরদিন অনিমেষের প্রাচীন বাড়িতে গোপালকে প্রথম দেখে লিপি। সকালে অনিমেষ অন্যরকম। বাড়ির দরজার চাবি ঘোরালে খুলছিল না, নানা কসরতের প্রয়োজন হচ্ছিল। সে' কসরতে রেগে উঠতে দেখেছিল অনিমেষকে। বাইরে দাঁড়িয়ে অনিমেষ চাবি ঘোরাচ্ছে, দরজা খুলছে না, আর অনিমেষ রেগে উঠছে – গালাগালির স্রোত বইছে মুখে আর সেই সময় বাড়ির ভিতর থেকে গোপালের গর্জন শুনেছিল লিপি। দরজা খুলে যেতেই দৌড়ে ঘরে ঢুকেছিল অনিমেষ – সদর পেরিয়ে দু ধাপ সিঁড়ি দিয়ে উঠেই একটা ঘর – টিভি, প্লাস্টিকের ডাইনিং টেবল, চেয়ার, একটা ডিভান আর এক বিশাল খাঁচায় পেল্লায় জার্মান শেফার্ড। অনিমেষ খাঁচার দরজা খুলে দিয়েছিল – বিশাল সারমেয় দুপায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে অভিরূপকে জড়িয়ে ধরেছিল – মুখ চাটছিল – অনিমেষ হাত বাড়িয়ে বলেছিল – 'মীট মাই ব্রাদার – গোপাল।' তারপর গোপালের কানের কাছে মুখ নিয়ে বলেছিল – 'আমার বৌ। তোর বৌদি। প্রণাম কর।' গোপাল মাথা ঘষেছিল লিপির পায়ে – পেট উল্টে শুয়ে পড়েছিল লিপির সামনে।

অনিমেষ বলেছিল – 'আদর করো।' তারপর হেসে বলেছিল – 'গোপালের কথা বলছি।'

লিপি অবাক হয়ে বলেছিল, 'এই ক'দিন ওকে কে দেখল ? খেতে দিল কে ?'

– 'পিন্টু ছিল। পাশের বাড়ির। বৌভাতে এসেছিল, মনে নেই ? কেউ বাড়িতে না থাকলে, গোপাল খাঁচায় থাকে। অফিসের দিনে, দুপুরের দিকে পিন্টু এসে খাইয়ে যায়, বাইরে ঘুরিয়ে আনে। তোমার তো মর্নিং স্কুল। খুব বেশিক্ষণ ওকে থাকতে হবে না খাঁচায়। এই জন্যই তোমাকে ...'

এই অবধি বলে অনিমেষ চুপ করে গিয়েছিল। লিপির দিকে তাকিয়ে চোখ নামিয়ে নিয়েছিল। বলেছিল, 'শুনতে খারাপ লাগলো, না ?'

লিপি মাথা নেড়ে হেসেছিল – 'আমিও দেখে নিয়েছিলাম তোমার বাড়ি টাই আমার স্কুলের সব চে' কাছে।'

অনিমেষ এবারে তাকে দীর্ঘ চুমু খেয়েছিল। আঁকড়ে ধরেছিল ।

গোপাল খাঁচার ভেতর ঢুকে গিয়েছিল। দু'থাবায় মুখ গুঁজে চোখ বুজেছিল।

লিপির স্কুল খুব ভোরে। সে বাড়ি ফেরার অনেক আগেই অনিমেষ অফিস চলে যায়। লিপি ফিরে খাঁচা খুলে দেয়। তারপর, অনিমেষের ফেরা অবধি এ'বাড়িতে শুধু গোপাল আর লিপি। লিপি রান্না বসায়, উঠানে কাপড় মেলে দড়িতে, আর গোপাল ওর বিশাল শরীর নিয়ে লিপির পায়ে পায়ে ঘরময় ঘুরঘুর করে, কখনও থাবার মধ্যে মুখ রেখে চোখ পিটপিট। গোপালকে খেতে দেয় লিপি, হাঁটতে বেরোয়, কখনও উঠোনের কলে স্নান করালো; হয়তো সোফায় বসে কাগজ পড়ছে লিপি, পায়ের কাছে দুপুরের রোদ – গোপাল ওর কোলে ধপ করে শুলো – হাল্কা রোঁয়া সারাঘরে উড়ে বেড়ালো খানিক, থিতিয়ে গেল মেঝেয় –

লিপি অনিমেষের মিলনকালে, গোপাল খাঁচায় থাকত। অনিমেষ গোপালের মাথায় হাত বুলিয়ে বলে যেত – 'একটু খাঁচায় থাক। এক্ষুণি আসব। এক্ষুণি।' অতঃপর মিলনপর্ব দ্রুত হ'ত। পাশের ঘরে, খাঁচার ধাতব মেঝেতে গোপালের পাশ

ফেরার শব্দ পেত লিপি। অনিমেষ দ্রুততর হত। তারপর দৌড়ে খাঁচার সামনে এসে দরজা খুলে দিত। বিশালদেহী গোপাল অনিমেষের সঙ্গে ওদের ঘরে এসে ঘুমোতো। গোপালের বড় বড় নিঃশ্বাস, পাশবালিশে হাত রেখে অনিমেষ হাল্কা নাক ডাকছে, মাথার ওপর পুরোনো সিলিং ফ্যান ঘুরে চলেছে অবিরাম; রাস্তার আলো অথবা জ্যোৎস্না জানলা দিয়ে ঢুকছে; ঘরময় গোপালের গন্ধ, সিগ্রেটের ঘ্রাণ, পাউডারের বাস – গোপাল, লিপি আর অনিমেষ একেই সুখ বলে চিনেছিল।

আজ প্রায় মাঝরাতে স্ট্রীটলাইটের তলায় দাঁড়িয়ে লিপি অনিমেষকে কী বলবে ভাবছিল। গত দুই রাত সে নিজেকেই দোষী বলে ভেবেছে, প্রতিটি মিনিট প্রতিটি সেকন্ড অপরিমেয় গ্লানি তার শোককে ছাপিয়ে গিয়েছে। গত পরশুও এমনই শীত পড়েছিল। রাতে গোপালকে নিয়ে হাঁটতে বেরিয়েছিল লিপি। রোজকার রাতের হাঁটা – গলি পেরিয়ে বড় রাস্তার ফুটপাথ ধরে এক চক্কর দিয়ে বাড়ি। গোপাল বরাবরই হাঁটায় উৎসাহী, লাফিয়ে লাফিয়ে চলছিল – তাল রাখতে লিপির সামান্য হাঁফ ধরছিল সেদিন। বড় রাস্তায় ট্রাক, রুটের বাস, অটো – গোপালের গলার বকলস আর শিকলির জোড় আলগা হয়ে গিয়েছিল সম্ভবতঃ বহুদিন। সেদিনই ছিঁড়ে গেল। ভারি ট্রাক এসে পড়ল তখনই। লিপির হাতে ধরা শিকলিতে তখনো গোপালের বকলশ ঝুলছে। এক মুহূর্তে নেই হয়ে গিয়েছিল গোপাল।

অনিমেষ সচরাচর রেলস্টেশনে নেমে হেঁটে আসে। গোপাল বহুদূর থেকে ওর গন্ধ পেয়ে ডেকে উঠত। সেই ডাক শুনে ভৌ ভৌ করে দৌড়োদৌড়ি করত গলির কুকুর, তারপর বড় রাস্তার কুকুররা ডেকে উঠত – মেক্সিকান ওয়েভের মত কুকুরের ডাক পৌঁছত অনিমেষের কানে। গলি টুকু প্রায় দৌড়ে ঢুকত বাড়িতে। গোপাল দু পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে মুখ চাটত অনিমেষের। লিপি ততক্ষণে ভাত বসিয়েছে। আজ পাড়া নিশ্চুপ, গলি শুনশান – শুধু আলোর তলায় লিপি একলা দাঁড়িয়ে। লিপির দাঁড়ানোর ভঙ্গী, ওর কান মুখ ঢাকা শাল, ওর দীর্ঘ ছায়া, মাথার ওপর ঝাঁক বেঁধে আসা মশা অনিমেষকে যেন সমস্ত বলে দিল এক মুহূর্তে। এমনকি অনিমেষ যেন লিপির হাতের ছেঁড়া শিকলিও দেখতে পেল যাতে গোপালের বকলশ ঝুলে রয়েছে। হাতের ব্যাগ নামিয়ে রেখে অনিমেষ বলল –

– 'কখন ? কষ্ট পেয়েছিল ?'

– 'ঘরে চলো'। লিপি বলেছিল শুধু।

বাড়িতে ঢুকে থমকে দাঁড়ালো অনিমেষ, ডুকরে উঠলো খালি খাঁচার সামনে। একটু ঝুঁকে জুতোর ফিতে খুলল তারপর হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকে গেল খাঁচায়। গোপালের মতই লাগছিল অনিমেষকে – জামা প্যান্ট বেল্ট আর মোজা পরা গোপাল যেন গুঙিয়ে গুঙিয়ে কাঁদছে আর হামাগুড়ি দিচ্ছে। খাঁচার মেঝেতে, লোহার জাফরিতে হাত বোলাচ্ছিল অনিমেষ।

– 'গোপাল এখান থেকে আমাদের দেখত। কত বড় লাগছে ঘরটা, দ্যাখো লিপি – কত বড়। আমরা শুধু দুজন এই অ্যাতো বড় ঘরে। অ্যাঁ! আমরা দুজন শুধু –'

লিপি খাঁচার পাশে বসল, গরাদের ফাঁক দিয়ে অনিমেষের আঙুল ধরার চেষ্টা করল প্রথমে তারপর নিজেও ঢুকে গেল খাঁচায়। অনিমেষের পাশে বসে লিপি দেখছিল – কত কত উঁচুতে উঠে গেছে এতকালের ছাদ, ফ্যানের ব্লেডে যেন জন্মের ঝুল কালি, দেওয়ালে অনিমেষের মা বাবা, ক্যালেন্ডারের পিছন থেকে ঐ সরে গেল টিকটিকি, দরজার মাথায় মাকড়শার জাল, ঘড়ির কাঁটা টক টক টক আওয়াজ করে ঘুরেই চলেছে, ঘুরেই চলেছে – সুখের প্রলেপ মুছে গিয়ে ওদের প্রতিদিনের ঘরদুয়ার মলিন আর জীর্ণ দেখাচ্ছে। খাঁচা থেকে বেরোনোর কথা ভাবল না দুজনের কেউ। ধাতুর শক্ত মেঝেতে গোপালের পুরোনো তোয়ালে পাতা – শোকে অশ্রুতে মাখামাখি হয়ে পাশাপাশি শুয়ে রইল দুজনে। গুটিয়ে এইটুকুনি হয়ে। লিপি ওর গায়ের চাদর বিছিয়ে নিল দুজনের ওপর।

শেষ রাতে অনিমেষ চাদর সরিয়ে দিল, সার্ট খুলল তারপর গেঞ্জি খুলে ছুঁড়ে ফেলল, খাঁচার মেঝে ছেঁচড়ে তা গুটিয়ে গেল এক কোণে – যেন ছোট্টো গোপাল – সাদা, শুধু কোমর আর নাকের কাছে ছোপ ছোপ – অনিমেষের ঘামের দাগ।

অনিমেষ উঠে এল লিপির ওপর। – 'এভাবে বাঁচতে পারব না, লিপি। কেউ তো নেই – দ্যাখো কেউ ডাকছে না, কোথাও কোনো শব্দ নেই – উফ কী অন্ধকার –

– 'আমি তো আছি। গোপাল আসবে। আবার আসবে। আমাদের গোপাল – তোমার আমার গোপাল। কী ? আসবে না ?'

– 'কেউ থাকবে না। আমি না, তুমি না, যে আসবে, সেও না – কী হবে ? কী হবে লিপি ? আমার যে ভয় করে। সব ছেড়ে চলে যাই চলো। যাবে ? বোধিবৃক্ষ কোথায় জানো লিপি ? জানো তুমি ?'

লিপিকে আঁকড়ে চীৎকার করছিল অনিমেষ।

পাখি ডাকছিল। খাঁচার বাঁদিকের দরজা দিয়ে ভোরের রোদ ঢুকেছে। লিপির ঘুমন্ত মুখ, গ্রীবা, স্তন সোনালী আভায় অপার্থিব। গলিতে সাইকেলের বেল, রিক্সার হর্ন, কুকুর ডেকে উঠল; বড় রাস্তা থেকে গাড়ির আওয়াজ আসছিল। এফ এমে আমি যামিনী তুমি শশী হে বাজছিল। পিন্টুদের রান্নাঘর থেকে ডালে ফোড়ন দেওয়ার ঝাঁঝালো ঘ্রাণ এলো জানলা দিয়ে। খাঁচার অন্য দিক তখনও রোদহীন, সেখানে গোপালের ঝরা রোম, গোপালের লালার দাগ, কুঁকড়োনো গেঞ্জি, এবং প্রবল শৈত্য। খাঁচার গরাদে বরফ জমেছে যেন। অনিমেষ দোটানায় ছিল।

ইন্দ্রাণী দত্ত – সিডনির বাসিন্দা পেশায় বিজ্ঞানী কিন্তু গল্প লেখার তীব্র আকুতি টের পান। শঙ্খ ঘোষ বলেছিলেন, ''আমরা যখন সত্যিকারের সংযোগ চাই, আমরা যখন কথা বলি, আমরা ঠিক এমনই কিছু শব্দ খুঁজে নিতে চাই, এমনই কিছু কথা, যা অন্ধের স্পর্শের মতো একেবারে বুকের ভিতরে গিয়ে পৌঁছয়। পারি না হয়তো, কিন্তু খুঁজতে তবু হয়, সবসময়েই খুঁজে যেতে হয় শব্দের সেই অভ্যন্তরীণ স্পর্শ।'' ইন্দ্রাণী খুঁজে চলেছেন।

চুমকি চট্টোপাধ্যায়

কোহিনূর পাঞ্জাবি স্টোর্স

বহুদিন বাদে আমহার্স্ট স্ট্রীট দিয়ে যেতে গিয়ে ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার মোড়ে সিগনালে গাড়িটা দাঁড়াতেই ডান দিকে চোখ গেলো। চোখে পড়ল আলো ঝলমল অঞ্জলি মল। এতো মেয়েদের পোষাক দেখছি ! চমকে গেলাম। আরে ! এখানেই তো কোহিনূর পাঞ্জাবি স্টোর্স ছিল ! কি ভীষণ নাম করা পাঞ্জাবির দোকান ছিল। গেলো কোথায় ?

সিগনাল সবুজ হতেই গাড়ি গড়াতে শুরু করল। আমার মনটা আটকে গেল বছর পঁচিশ আগের কিছু কথপোকথনে।

– ভাইটু, এই ভাইফোঁটায় কি নিবি বল। বেশি দামী কিছু চাসনা কিন্তু, তোর দিদিয়ার রোজগার জানিস তো ...।

– দিদিয়া, আমাকে কোহিনূর পাঞ্জাবি স্টোর্স থেকে একটা পাঞ্জাবি কিনে দিবি। অয়ন পরেছিল। কি সুন্দর কাজ করা। ও বলছিল, এরকম কাজ কলকাতার আর কোনো জায়গায় পাওয়া যায় না। বেশি কাজের পাঞ্জাবি দরকার নেই, কম কাজের হলেই হবে।

চোদ্দ বছরের ভাইয়ের গাল টিপে বলেছিলাম, 'আচ্ছা বেশ। তাই দেবো। এই শনিবার আমার সঙ্গে চল তবে, পছন্দ করে কিনে নিবি।'

মেরুন রঙের ওপর চন্দন রঙের সুতোর সূক্ষ্ম কাজের একটা পাঞ্জাবি পছন্দ করে কিনেছিল আমার ভাই প্রদীপ্ত।

ভাইটুর চলনে বলনে একটা মেয়েলি কমনীয়তা আছে। ওর বন্ধুদের অনেকে এই নিয়ে ওকে খেপায় অনেক সময়। ভাইটু তাতে কিছু মনে করেনা, হাসে। আমার কিন্তু খুব ভালো লাগে ভাইকে। খুব সুন্দর স্বভাব ওর। নরম মন। আরো বড় হলে পুরুষালি ভাব আপনা আপনি চলে আসবে।

*** *** *** ***

আমি ভাইয়ের থেকে এগারো বছরের বড়। মা টিচার ছিল। স্কুলে চলে যেত। আমিই বেশি ঘাঁটাঘাঁটি করেছি ভাইটুকে। শীলাদি ছিল রাতদিনের লোক। শীলাদিও ভাইকে খুবই যত্ন করত আমরা যখন বাইরে থাকতাম।

ভাইটু যত বড় হতে লাগল আমার অনুমানকে ভুল প্রমাণিত করে ওর মধ্যে মেয়েলিভাব আরো প্রকট হতে লাগল। আমার জামাকাপড় পরে বসে থাকত, বিশেষ করে সালোয়ার কামিজ। সাজের জিনিসের ওপর অসম্ভব আকর্ষণ প্রকাশ করত।

লিপস্টিক আর কাজল হয়ে উঠল ওর অতিপ্রিয় কসমেটিক্স । তখনো আমার মনে হত, বেশি সময়টাই তো আমার সঙ্গে কাটায়, তাই বোধহয় এসবের ওপর আকর্ষণ জন্মেছে। কিন্তু যেদিন ইউনিভার্সিটি থেকে ফিরে দেখলাম ভাইটু দুহাতে নিটোল করে শেপ করা নখে আমার সদ্য কেনা সিলভার নেলপলিশ লাগিয়ে বসে আছে, সেদিন বেশ একটু ভয়ই পেয়ে গেলাম। একটু কি বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না ?

বাবা বরাবরই সাংসারিক ব্যাপারে তাপুত্তাপহীন মানুষ। ছেলে মেয়েরা কে কি করছে তাও হয়তো ঠিকঠাক জানেন না। ভাইয়ের এই চেহারা বাবার চোখে না পড়ারই কথা। কিন্তু মা তো সব ব্যাপারে যথেষ্ট সচেতন, মায়ের চোখে পড়েছে কি ? মা কে কিছু হিন্ট দেব কি ?

ভাবনা - চিন্তা - দোলাচলে চলতে চলতে দিন পার হতে থাকল। আমার বিয়ে ঠিক হল। বিয়ে হয়েও গেল। বিয়ের দিন ভাইটু ধুতি পাঞ্জাবি পরল। সেই কোহিনূর পাঞ্জাবি স্টোর্সেরই পাঞ্জাবি। কালোর ওপরে জরির কাজ। এই অবধি ঠিক ছিল। কিন্তু কোথা থেকে জোগাড় করে সুরমা টানলো চোখে। বিস্তর হাসাহাসি করল প্রায় সবাই। আমার কান্না পেল। আমার ভাইটুর হল কি ?

*** *** *** ***

বিয়ের পর আমি চলে গেলাম গাজিয়াবাদ। সেখানে একটা চাকরিও পেয়ে গেলাম। ব্যস্ত হয়ে পড়লাম কাজ আর সংসার নিয়ে। ভাইটুর খুব শখ ছিল ফিল্ম স্টাডিস পড়ার। ভর্তিও হয়েছিল সত্যজিৎ রায় ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইন্সটিটিউটে। কিন্তু তারপর কেমন সব গোলমাল হয়ে গেল।

মা একদিন ফোন করে কান্নাকাটি করে বলল, 'রাখী, তুই পারলে আয় একবার। তোর ভাইটুকে নিয়ে খুব বিপদে পড়েছি। এ বিপদ সাধারণ নয়, কারুকে বলার মতনো নয়। তুই আয় পারলে।'

অবাক হলাম এবং যারপরনাই শঙ্কিত হলাম। মা তো এরকম অল্পে ভেঙে পড়ার মানুষ নন। তাহলে ভাইটুর এমন কী হল যে মা কাঁদছে ! বিয়ে ফিয়ে করে বসল না কি রে !

দিন পাঁচেক বাদে বাড়ি এলাম। মা আমাকে দেখেই হাউমাউ করে উঠল। মাকে জড়িয়ে ধরে শান্ত করে সোফায় বসিয়ে বললাম, 'কী হয়েছে ভাইটুর ? ও এখন কোথায় ?'

– তোর ভাইটু মেয়ে হতে চায় !

ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বললাম, 'মেয়ে হতে চায় মানে ?'

– ওর নাকি মেয়েদের সবকিছু ভালো লাগে, মনে মনে ও নাকি পুরোপুরি মেয়ে তাই অপারেশন করিয়ে শরীরেও মেয়ে হতে চায়। এখন গেছে ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলতে। আমি কিচ্ছু বুঝতে পারছিনা, কিচ্ছু আর ভাবতে পারছিনা রাখী রে .... দুহাতে মুখ ঢেকে কাঁদতে লাগল মা। আমি অপেক্ষা করতে লাগলাম ভাইটুর ফেরার।

*** *** *** ***

গাড়িটা ব্রেক কষতেই ঝাঁকুনি খেয়ে বর্তমানে ফিরলাম। বদলে যাওয়া জীবনকে মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিলাম আমি, আমার মা বাবা। ভাইটু আমাদের খুব আদরের ছিল যে! কত ছোট আমার থেকে আমার ভাই ... না সরি, বোন। হ্যাঁ, ভাইটু সেক্স চেঞ্জ করিয়ে আমার বোনটু হয়ে গেছে। ওর নাম এখন প্রদীপ্তা ! ঠিক যেমন কোহিনূর পাঞ্জাবি স্টোর্স অঞ্জলি মল হয়ে গেছে !

Chumki Chatterjee — Co-editor, Kishore Bharati Magazine. CEO — Patra Bharati Publication. Hobbies : Reading, writing, shopping.

শাশ্বতী বসু

বাসকিনস রবিনস ও বনমালা

এবার তোমার টার্ন ব্রতদীপ — কৌশল্যা আন্টি বলে ওঠেন ব্রতর দিকে লক্ষ্য করে। 'দেবী ভার্গব' স্কুলে ক্লাস চলছে গ্রেড ওয়ানের। সাবজেক্ট — 'শো এ্যান্ড টেল'। ক্লাসে কোনো একটা জিনিষ নিয়ে এসে সবাইকে সেটা দেখিয়ে তার সম্পর্কে বলতে হবে পাঁচ মিনিট। এখন ব্রতদীপ বলবে।

ব্রত ধীরে ধীরে ওঠে। কৌশল্যা আন্টির চেয়ারের পাশে গিয়ে দাঁড়ায়। টেবিলের ওপর তার আজকের 'শো এন্ড টেলের' জিনিষটি। ছোট লম্বাটে ধরনের জিনিষটি — কাগজের মোড়কে আটকানো। আস্তে আস্তে ব্রত কাগজের মোড়কটি খুলে হাতে তুলে নেয় জিনিষটি। ক্লাসের সবার কৌতূহলী দৃষ্টিতে ধরা পড়ে ছোট একটা বোতল — কাচেঁর। তার মুখে একটি পলতে মত জিনিষ উঁকি মারছে।

ব্রতদীপ বলে — আজ আমি সবাইকে এই ছোট জিনিষটি দেখাবো। এটা একটা ল্যাম্প। ছোট্ট। তেল ভরে এই মুখটাতে আগুন ছুঁইয়ে দিলে জ্বলে ওঠে। আলো দেয়। এটার নাম কুপি। যাদের বাড়ীতে ইলেকট্রিকসিটি নেই তারা এটা জ্বালায়।

— তুমি এই ল্যাম্পটা কোত্থেকে পেলে ব্রতদীপ? জিজ্ঞাসা করেন কৌশল্যা আন্টি।

— আমার বন্ধু আমাকে দিয়েছে। যখন ওর বাড়ীতে আমরা এক উইক এন্ডে গেছিলাম।

ওদের ভিলেজের বাড়ীতে। ওকে আবার আমার মা বিকেলে পড়ায়। আমার বইগুলো দিয়ে।

— তোমার বন্ধুর বাড়ীতে ইলেকট্রিসিটি নেই?

— না, ওর বাড়ী অনেক দূরে। ভিলেজে। প্রথমে ট্রেনে, তারপর অটো রিকশাতে, তা . . . রো . . . প . . . রে একটা ভ্যান রিকশা করে যেতে হয়। ওদের একটা কুকিং স্টোভ আছে মাটিতে। মাটি খুঁড়ে বানানো। আর টুইগ আর ড্রাই লিভস দিয়ে ওটা ধরানো হয়। ওদের একটা ছোট্ট পন্ড আছে। মাছ ঘুরে বেড়ায় সেখানে। আপন মনে বলতে থাকে ব্রতদীপ।

কৌশল্যা আন্টি শোনেন। জানেন এর সবটাই নয়তো বেশীর ভাগ কথাই সত্যি। ব্রতদীপের দেখার দৃষ্টি যে বেশ গভীর তাও তিনি জানেন। তাই জিজ্ঞাসা করেন,

— তোমার বন্ধু এখানে মানে এই শহরে কি করে এলো ব্রতদীপ?

— ও তো এখানে একটা মিষ্টির দোকানে কাজ করে। আমি তো রোজ ওখান থেকে লবঙ্গলতিকা কিনি। স্কুলের লাঞ্চের জন্য। ওই তো আমাকে ছোট একটা বক্সে ভরে দেয়। আর হাসে। বন্ধু তো! ও স্কুলে যায় না। ওর নাম মানিক।

— তোমার মিষ্টিটির কি নাম বললে? আন্টি জিজ্ঞেস করেন।

— লবঙ্গলতিকা। পরিষ্কার করে টেনে টেনে বলে ব্রতদীপ।

— বাঃ ভারী মিষ্টি নাম তো। আর তোমার কুপির গ্রামের গল্পটি ও চমৎকার। আমারই ওখানে যেতে ইচ্ছে করছে। সস্নেহে বলেন কৌশল্যা আন্টি।

লাঞ্চের ঘন্টা পড়ে। ক্লাস শেষ হয়।

ছুটির পরে বাসের লাইনে দাঁড়িয়ে ব্রতদীপ। পিঠের ওপর একটা প্রচন্ড ঘুষি খেয়ে ও চমকে ঘুড়ে দাঁড়ায়। রোহিত। হাসছে হ্যা, হ্যা করে। ওর সবসময়ই হাসি হাসি মুখ। ব্রতর প্রাণের বন্ধু। এক পাড়াতেই থাকে ওরা। কানপুরে বড় হওয়া রোহিতের বাংলায় তাই অবাঙ্গালী টান। অসহিষ্ণু রোহিত জিজ্ঞাসা করে ।

— টোর ভিলেজ ফ্রেন্ড আছে, বলিসনি টো ? কি যেন কুটি না কি টোকে ডিয়েছে, বলিসনি, টো, টুই ভিলেজে গেছিলি ? ব্রতদীপ ব্যাপারটা বুঝতে পারে। বলে,

— তুই ওর বন্ধু হবি, তাহলে ভিলেজে যেতে পারবি।

— হ্যাঁ . . . অনেকটা ঘাড় কাত করে রোহিত।

— তাহলে মিষ্টি কিনবি ওর কাছ থেকে ?

— কিনবো . . . অম্লানবদনে বলে রোহিত। কি টোর ওই লংটিকা না কি ওটা কিনবো। যেটা টুই খাস রোজ। তো তাই ঠিক হয়। রোহিত যাবে মানিকের সাথে বন্ধুত্ব করতে মিষ্টির দোকানে। মিষ্টি কিনবে। যখন মিষ্টি কিনবে তখন মানিকের দিকে তাকিয়ে হাসবে। ওরা বন্ধু হয়ে যাবে। রোহিত ওর বন্ধুদের নিয়ে যাবে। যারা ওর ফুটবল টিমের বন্ধু।

রোহিত ফুটবল খেলে এই পাড়ার পার্কে। পাড়ার সব ছেলেরাই প্রায় ওর বন্ধু। রোহিত এদের লীডার। ভালো খেলে আর মিশুকে স্বভাবের জন্য সবাই ওকে ভালবাসে। রোহিতকে সবসময়ই এক দঙ্গল ছেলেদের সাথে দেখা যায়। নীলা রোজই ব্রতদীপকে নিয়ে সকালে স্কুলে যাবার আগে একটা মিষ্টির দোকানের সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। নাম বরোদা মিষ্টান্ন ভান্ডার। ব্রত মিষ্টি কেনে ওর লাঞ্চের জন্য। কিন্তু আজ অবাক কান্ড। মিষ্টির দোকানে বেশ ভীড়। অধিকাংশই ব্রতর বয়সী। রোহিত কেও দেখা যায় ভীড়ের মাঝে। নীলা খুব অবাক হয়। রোহিতদের নীলা ঘনিষ্ঠভাবেই চেনে। বিশেষ করে ওর মা উর্মিকে। উর্মি মিষ্টি থেকে শতহাত দূরে। তবে? রোহিত কি করছে মিষ্টির দোকানে ? উর্মিকে কাছে পিঠে খোঁজে নীলা।

— ঐ তো দাঁড়িয়ে . . .

ওকে দেখে উর্মিও এগিয়ে আসে। ওর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গীতে তড়বড় করে বলে ওঠে —

— দেখো তো কি কান্ড ! রোহিত ডেইলী মিষ্টি কেনার জন্য আজকাল জিদ্দিপনা করছে। বলে লংটিকা কিনবো। ও কিনছে, ওর বন্ধুরা কিনছে। ফটিকের সঙ্গে কথা বলছে। হাসছে। কি যে হচ্ছে বুঝি না।

— মনে হয় লবঙ্গলতিকার কথা বলছে। ওটা একটা মিষ্টির নাম। লংটিকা নয়। নীলা বলে। লবঙ্গলতিকা। আর ফটিক নয়। মানিক

— ওই হোল — আর কি। আমি এগোচ্ছি। তড়বড় করতে করতে উর্মি এগিয়ে যায়।

নীলা আনমনা হয়। এইখানে বরোদা মিষ্টান্ন ভান্ডারে মিষ্টি কিনতে এসেই মানিককে দেখেছিল নীলা। ব্রতর চেয়ে দু এক বছরের বড় হবে হয়তো। মানিক বলেছিল — এই মিষ্টিটা নিন দিদি — খুব ভালো খেতে।

দোকানের মালিক অনাথ ঘোষ কাছেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। বলেছিলেন

— হ্যাঁ, দিদি। নিয়ে যান লবঙ্গলতিকা, একবার খেলে আবারও আসতে হবে।

নাম শুনে চমকে গেছিল নীলা। লবঙ্গলতিকা ? এই মিষ্টির দোকানে লবঙ্গলতিকা বিক্রি হচ্ছে ? নীলা জানতো মিষ্টিটা শুধু ওর মা-ই বানাতে পারে। মা অপূর্ব বানাতো মিষ্টিটা। মুচমুচে ময়দার খোলের মধ্যে লবঙ্গ গন্ধী ক্ষীর — খোলের ভাজের

মুখ আটকানো ছোট্ট একটি লবঙ্গ দিয়ে। চিনির হালকা শিরার মধ্যে ডুবিয়ে আনা হোত ঘিয়ে ভেজে। সত্যি খেলে ভোলা যায় না, এমন স্বাদ ছিল মিষ্টিটার।

— নেবেন তো ? জিজ্ঞাস করেছিল মানিক।

— হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই — বলেছিল নীলা।

মিষ্টি কিনেছিল সেদিন। তারপর আবার পরদিন — তারপর রোজ। মিষ্টি কেনার সূত্রে মানিকের সঙ্গে আলাপ। মানিককে রোজ একঘন্টা করে পড়ানো। তা ও কতদিন হয়ে গেল। দুপুরে একদিন নীলা সবে দুপুরের খাবারের পরে হালকা একটা বই নিয়ে গড়াচ্ছিল। ডোর বেলটা বেজে উঠেছিল। দরজা খুলতেই দেখেছিল নেপালী বাহাদুর — বিল্ডিং এর সিকিউরিটি হেড — দাঁড়ানো।

— এক মাইজি আপনার সাথে দেখা করতে চায় মেমসাব। গেটের বাইরে দাঁড়ানো। নিয়ে আসবো কি ?

তারপর একটু ইতস্ততঃ করে বলে।

— কামকায়ওয়ালা মাঈজী মালুম হয়। নিয়ে আসবো কি ?

— হ্যাঁ, নিয়ে এসো সঙ্গে করে। নীলা বলে শান্ত কিন্তু দৃঢ় স্বরে। নীলা ভাবছিল মহিলা কে হতে পারে।

— নমস্কার দিদি।

হালকা একটা তাঁতের শাড়ী পরা রোগা লম্বা এক মহিলা খুব মৃদু স্বরে বলে। শাড়ীতে এবং সর্ব অবয়বে দারিদ্র্যের ছাপ। কোলে রোগা একটি মেয়ে বছর দুয়েকের — খেতে না পাওয়া হা ঘরে চেহারা।

খুব অবাক হয়ে তাকাতেই পাশে মানিককে দেখতে পায় নীলা।

— আমার মা, আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে দিদি। মানিক বলে।

— ও মা, তাই না কি! খুশী হয় নীলা। এসো, এসো ঘরে এসো।

— আমার নাম সাবিত্রী, নাম ধরেই ডাকবেন আমাকে। সাবিত্রী ঘরে ঢোকে।

— আমার মেয়ের নাম বনমালা। কোলের শিশুটিকে দেখায় ও।

— বসো এখানে। সোফার দিকে নির্দেশ করে নীলা।

সাবিত্রী কিন্তু বসে না। দাঁড়িয়ে থাকে।

সাবিত্রী একটা হাতে বোনা আসন এনেছিল। ঘাস দিয়ে তৈরী। বলেছিল

— দিদি আমি নিজের হাতে বুনেছি। আপনি মানিককে পড়ান। কি দিয়ে যে আপনার ঋণ শোধ করবো জানি না। তবে আমাদের বাড়ী যাবেন। কদমতলায় — গ্রামে। দেখবেন গ্রাম ভালো লাগবে।

কি যেন একটা ছিল সাবিত্রীর চেহারায়। না খেতে পাওয়া কিন্তু একটা আত্মসম্মানবোধ, একটা আত্মপ্রত্যয়, যা তাকে সাধারণ বলে ভাবতে একটু বাধা দিচ্ছিল নীলাকে। নীলা কথা দিয়েছিল গ্রামে যাবে — কদমতলায়।

তারপর নীলারা এক উইক এন্ডে কদমতালায় গেছিল, মানিকদের গ্রামে। দেখেছিল মানিকদের জীবনযাত্রা। গরীবের থেকেও ওরা গরীব।

মানিকের বাবা বিছানায় অজানা অসুখে শুকিয়ে আসছে তার জীবনী শক্তি। কিছু করতে পারে না।

বনমালা — মানিকের ছোট বোন বেঁচে আছে একটা দুধেল গরুর দয়ায়। কিম্বা মানিকের দয়াও বলা যেতে পারে। গরুটি ধারে কেনা। মানিকের মাস মাইনের পাঠানো টাকা থেকে শোধ করা হয় ধার। প্রতিমাসে। দুবার টাকা না দিতে পারলে গরু চলে যাবে যে ধার দিয়েছিল তার কাছে।

— গরুটার জন্যই বনমালা বেঁচে আছে। না হলে . . . বলে চুপ করে গিয়েছিল সাবিত্রী।

সুনন্দ আর ব্রত গ্রামে ঘুরতে বেরিয়েছিল মানিকের সাথে। মানিক ব্রতকে কুপি উপহার দিয়েছিল।

নীলার সময় কেটেছিল আনন্দ উচ্ছল বৌ মেয়েদের কৌতূহলের মধ্যমনি হয়ে।

ব্রতকে বাসে তুলে উর্মিকে বাই করে বাড়ীমুখো হয় নীলা। ধীরে ধীরে হাঁটে।

এই নলিনীরঞ্জন এ্যাভিনিউ এর দু পাশে বকুল গাছের সারি। কিছু কদম গাছ পথটাকে ছায়াময় করে রেখেছে। পথের একটু ভেতর দিকে পেল্লায় সব বাড়ী। পুরনো বনেদী। এ সব বনেদী বাড়ীর কিছু কিছু এখন অফিস বাড়ীতে পরিণত হয়েছে।

ঐ তো ও পাশে দেখা যাচ্ছে বোরোলীন কোম্পানীর মেইন অফিস। তার পাশেই অর্ধচন্দ্রাকার ব্যালকনীওয়ালা তেতলা বাড়ীটা এখন 'লিটল ফ্লাওয়ারস' — বাচ্চাদের স্কুল। তার পাশেই দোতালার বাড়ীটার নীচতলাতে একদিকে 'স্লোয়ী রেইনবো' — একটা আইসক্রীমের দোকান। খুব একটা ভালো চলে না। টিমটিম করছে। তার পাশেই 'বরোদা মিষ্টান্ন ভান্ডার' — মনিক যেখানে কাজ করে। খারাপ চলে না। আজকাল তো মাঝে মাঝে বেশ ভীড়ই চোখে পড়ে। সকালে যেমন দেখছে। জমির দাম এখানে আকাশ ছোঁয়া। একটু জমি পাবার জন্য এখানে খুবই প্রতিযোগিতা। প্রায় অসুস্থ রকমের।

— বাড়ী চললেন দিদি ? দই দেবো নাকি আজ ? কেশর দই ? বরোদা মিষ্টান্ন ভান্ডারের অনাথ ঘোষ বিগলিত হয়ে জিজ্ঞেস করে তার প্রতিদিনের কাষ্টমারকে।

— দিন — সকালে আজ বেশ ভীড় দেখছি দোকানে . . .

— হ্যাঁ, তো আজকাল দেখছি ছেলেরা একটু আধটু মিষ্টি খাচ্ছে। সেটা তো আমার পক্ষে খুবই ভালো। না হলে মাথার ওপরে যা খাঁড়া ঝুলছে কখন কি হয় কিছুই বলা যায় না। আর কি বলবো ? সবই তো জানেন। বলে অনাথ।

হ্যাঁ নীলা কিছুটা জানে বৈকি। ঐ 'স্লোয়ী রেইনবো'র মালিক বেশ ভালো টাকা অফার করেছে। অনাথ ঘোষকে তার মিষ্টির দোকানটা ছেড়ে দেবার জন্য। 'বাসকিনস রবিনস' নামে একটা মাল্টি ন্যাসনাল কোম্পানীর সাথে 'স্লোয়ী রেইনবো' র একটা জয়েন্ট ভেনচারের কনট্রাক্ট ঝুলে আছে জায়গার অভাবে। 'বরোদা মিষ্টান্ন ভান্ডারের' জায়গাটুকু পেলেই ওরা সব শুরু করতে পারে। মাঝখানে অনাথ ঘোষ বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ছাড়ি ছাড়ি করেও অনাথ তার পৈত্রিক ব্যবসাটাকে বাজার দরের দ্বিগুণ টাকার বিনিময়েও ছাড়তে পারছে না। ব্যবসা ভালো চলছে না। তবুও না। 'বাঙ্গালী সেন্টিমেন্ট' অনাথের পরিচিতরা বলে।

'দেবী ভার্গব' স্কুলে গ্রেড ওয়ানের ক্লাস রুম। 'শো এন্ড টেলের' ক্লাস চলছে।

— এবার তোমার টার্ন অঙ্কিতা . . . বলে কৌশল্যা আন্টি অঙ্কিতার দিকে তাকান। অঙ্কিতা মানানি . . . সদ্য বাঙ্গালোর থেকে আসা ঝকঝকে মেয়ে অঙ্কিতা। যেন একটা পুতুল। টানা টানা চোখে বুদ্ধির ঝিলিক। পাতলা ঠোঁটে কথার ফুলঝুড়ি।

বুদ্ধি আর সৌন্দর্য্যের ঝিলিক তুলে অঙ্কিতা কৌশল্যা আন্টির পাশে গিয়ে দাঁড়ায়। বলতে শুরু করে 'আই উইল শো

ইউ নাউ এ ডল হু ক্যান টক' . . . অবশ্য সার্টেনলি কেউ বলে দিলে . . . বলে হাসিমুখে ও ক্লাসের সবার দিকে তাকায়। হাতে একটা মাঝারি সাইজের ডল। রামধনু রঙের টপ আর স্কার্ট পরা। দুহাতে ধরে আছে একটা ট্রে। তার মধ্যে কি সব রয়েছে ছোট ছোট।

কৌতূহলী ছেলেমেয়েরা আরো কৌতূহলী হয়ে ওঠে অঙ্কিতার সুন্দর বলার ভঙ্গীতে।

— থামছো কেন ? কনটিনিউ অঙ্কিতা — আন্টি বলেন।

— এই দেখো তবে। অঙ্কিতা বলে — 'হ্যালো', অমনি ডলটা বলে — 'হ্যালো'

অঙ্কিতা বলে 'আইসক্রীম খাবে ?' ডলটা অমনি রিপিট করে কথাটা।

— দেখলে আমি যা বলছি ডলটা সব বলছে ! আর দেখছো ও যখন আমার কথাটা রিপিট করছে তখন ট্রে টা উঁচু করে ধরছে। ট্রে তে কি আছে দেখো। আছে রেনবো কালারের আইসক্রীম। আমি আইসক্রীম খেতে ভালবাসি বলে ড্যাড আমাকে এই ডলটা আমার বার্থ ডে তে গিফট করেছে। বলে অঙ্কিতা হাসে। ডলটাও হাসে। কৌশল্যা আন্টি খুশী হন। বলেন খুব সুন্দর তোমার ডলটা অঙ্কিতা। আর আইসক্রীমগুলোর কি সুন্দর কালার !

ক্লাস শেষ হয়। সবাই অঙ্কিতার পুতুলের সামনে একটু ভীড় করে। কথা বলতে চায় পুতুলের সামনে। অঙ্কিতার সঙ্গেও একটু বন্ধুত্ব করতে চায়। সুন্দর অঙ্কিতা সুন্দর তার টকিং ডল।

স্কুল শেষ হলে ব্রত অঙ্কিতাকে দেখতে পায় 'স্লোয়ী' রেইনবোতে'। নীলাকে সব বলে অঙ্কিতার ডলের কথা — ওর আইসক্রীম পছন্দের কথা।

তারপর থেকে নীলা প্রায়ই দেখে অঙ্কিতাকে 'স্লোয়ী রেইনবোতে', আরো অনেক ছেলেমেয়েকেই দেখে অঙ্কিতার সাথে। নীলা ভাবে আইসক্রীম পার্লারে ভীড়টা যেন উত্তরোত্তর বাড়ছে। বরোদা মিষ্টান্ন ভান্ডারের ভীড়ও যেন ঠিক তেমন করে জমছে না। তবে কি 'বরোদা মিষ্টান্ন ভান্ডারের' দিন শেষ ?

এরমধ্যে একদিন বাড়ীতে ফিরতে না ফিরতে টিনার ফোন।

— মাসিমনি, কি করছো ?

— কেন রে ? আসছিস নাকি ? নীলা বলে।

— হ্যাঁ, আসছি। এই ঘন্টা খানেকের মধ্যে। টিনা বলে।

— খাবি তো ? নীলা ঘড়ির দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করে।

— হ্যাঁ, হ্যাঁ। দুপুরে খাবো তোমার ওখানে। এনিথিং। কিন্তু ভাত নয়। চটপট উত্তর টিনার।

টিনা নীলার দিদির মেয়ে। সবে হায়ার সেকেন্ডারী ফাইনাল দিয়েছে। দিদির একমাত্র মেয়ে। না চাইতেই অনেক পেয়ে টিনা হয়ে দাঁড়িয়েছে এখন রীতিমতো খামখেয়ালী আর খরচ করার ওস্তাদ। পরীক্ষার পরের অবসরটা নিয়ে ও কি করবে ভেবে পাচ্ছে না।

খানিক পরেই টিনা এসে হাজির। হালকা গোলাপী সিফনের ওপর চিকনের কাজ করা সালোয়ার কামিজে সুন্দরী টিনাকে আরো সুন্দর দেখাচ্ছে। ঝলমল করতে করতে ঘরে ঢোকে টিনা।

-কেন এলাম বলো তো ?

- কি করে জানবো ? তোর যা খামখেয়ালীপনা - নীলা বলে ।

- তোমাদের ওই ৪১/২ এন. আর. এ্যভিনিউতে একটা আইসক্রীমের দোকান কাউন্টারে সার্ভ করার জন্য ক্যান্ডিডেট চেয়েছে । পেপারে দেখলাম । সেটার জন্য খোঁজ করতেই এলাম । পরীক্ষা দিয়ে স্রেফ বসে আছি । ভাবছি এ্যাপ্লাই করবো ।

- বলিস কি ? নীলা অবাক হয় । তোর আবার টাকার কি দরকার পড়লো ? তোর বাবা তো মুখের কথা পড়তে না পড়তেই তোকে সব দিচ্ছে ।

- সে তুমি বুঝবে না । নির্বিকার টিনার উত্তর ।

হ্যাঁ সেটা ঠিক । টিনা যে ভাবে চলে তার সবটুকু নীলার বোঝার বাইরে । তবে কিছুটা বোঝে নীলা । টিনার কিসের এত খরচ । হুল্লোড়বাজ টিনার বন্ধুরাও ওরই মত । আমুদে, খরুচে ও হুল্লোড়বাজ । প্রায়ই ওরা বড় বড় রেস্টুরেন্টগুলোতে ওদের বার্থডে বা অন্যকিছু অকেসন সেলিব্রেট করতে যায় । সবচেয়ে মজার কথা, কে সবচেয়ে দামী গিফট দেবে এ নিয়ে পরস্পরের মধ্যে কম্পিটিশন চলে । অসম্ভব দামী দামী গিফট ওরা কেনে । নীলার এ সবই টিনার কাছ থেকে শোনা । নীলার গম্ভীর মুখ দেখেই নাকি কে জানে টিনা আসল কথাটা ব্যক্ত করে ।

- তুমিই বলো মাসিমনি, গৈরিক যদি তাজ হোটেল বুক করে ওর বার্থডে পার্টিতে, তবে কি তেমন কিছু একটা ওকে দিতে পারি ? তাছাড়া ও আমার বার্থডেতে যা দিয়েছিল তাও একদম ফ্যানটাসটিক । আমি ওকে ব্ল্যাক পার্ল বসানো টাই পিন দেবো ঠিক করছি । একটা পার্ট টাইম কাজ জোগাড় করতে পারলেই সেটা হয়ে যাবে । আমি চন্দ্রানী পার্লসে গিয়ে পার্ল দেখে এসেছি । চিকলেট চিবোতে চিবোতে নির্বিকার টিনা টিভির চ্যানেল ঘোরাতে বসে ।

- টাকা বেশী দেবে না বলেছে । তবে কম দিলেও করবো । গৈরিকের বার্থডের এখনও কয়েকমাস বাকী আছে । পার্ল ম্যানেজ হয়ে যাবে ।

দিন যায় একই ভাবে । এরমধ্যে একদিন বিকেলে মানিক এসে দাঁড়ায় নীলার সামনে । পিঠে ছোট একটা ব্যাগ ।

- দিদি, বাড়ী ফিরে যাচ্ছি । কদমতলায় ।

- কেন রে? শঙ্কিত নীলা প্রশ্ন করে ।

- দোকান বিক্রি হয়ে গেল । আইসক্রীমের দোকানের মালিক নিয়ে নিল দোকান । ওরা ওদের দোকান বাড়াবে । জায়গা চায় ।

- তোর তাহলে কি হবে ? তুই তো চাকরী নিতে পারিস ঐ নতুন আইসক্রীমের দোকানে ।

- না, ওরা আমাকে নেবে না । অনাথদাকে বলে দিয়েছে ।

হঠাৎ একটা অদ্ভুত দৃশ্য দেখলো যেন নীলা । একটা গরু শূন্যে মিলিয়ে যাচ্ছে . . . বনমালা মানিকের ছোট বোন কাঁদছে নীচে দাঁড়িয়ে ।

ব্রত এসে সামনে দাঁড়ায় । নীলার মন অন্ধকারে আচ্ছন্ন । মানিক অনেকক্ষণ চলে গেছে । ব্রত বলে মা তুমি কাঁদছো কেন ? মানিক আমাকে বলেছে - ও গ্রামে গিয়ে স্কুলে ভর্ত্তি হবে । ওর পড়তে ভালো লাগে । নীলা ভাবে তাই হোক, তবে ওদের জন্য কিছু করতেই হবে যাতে বনমালার খাবার শূন্যে মিলিয়ে না যায় । চোখের জল মুছে নীলা উঠে দাঁড়ায় ।

Saswati Basu — Profession: University Teacher in Economics, lives in Sydney.

I enjoy this beautiful life thoroughly. Particularly I enjoy listening to songs, reading books on sociology, short stories, and travelling around. I love watching drama, good cinema and tennis. I also love to experiment with new cooking recipes and share them with our friends. Believe in donating money to voluntary organisations for the people in need.

বিশ্বদীপ চক্রবর্তী

স্বপ্নের যাদুঘর

তিলকের ঘুম ভাঙ্গল অদ্ভুতভাবে। অথবা ভাঙ্গেনি, ছিঁড়ে গেছে আচমকা। ঝুলছে বৃন্তচ্যুত হওয়ার অপেক্ষায় শেষ হেমন্তের পাতার মত। যতটা জুড়ে আছে তাকে প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে তিলক ঘুমের মধ্যে ফিরে যেতে চাইছিল। ঘুমের জন্য নয়, স্বপ্নটার জন্য। আচ্ছন্ন হতে চাইছিল স্বপ্নের অভ্যন্তরে নিজের সচেতনতায়।

স্বপ্নে কি গন্ধ পাওয়া যায় ? নাহলে এমন তীব্রভাবে কেন এক গন্ধের অনুভূতি ছেয়ে আছে সমস্ত চেতনায় ? টেনে নিতে পারছে না নাসারন্ধ্রে অথচ বুকভরে খেলা করছে সেই গন্ধের রেশ এখনো। ঠিক তখনই তিলক বুঝতে পারল তার হাতে কিছু আছে। হাতের তালুতে নরম স্পর্শ নিয়ে ফুলের মত কিছু। চমকে উঠতেই ঘুমটা পুরোপুরি ছিঁড়ে গেল আবার জুড়ে যাবার প্রত্যাশা না রেখে। বেড সাইড ল্যাম্পটা জ্বেলে বাঁ হাতটা আলোর কাছে আনতেই আবার চমক। গন্ধরাজ ফুল। নিপাট, নিশুষ্ক, সতেজ। স্বপ্নে গন্ধরাজ ফুলের সুবাস ছিল ওটা ? ত্বরিত প্রতিক্রিয়ায় বাঁ হাত নাকের কাছে নিয়ে এসেছিল তিলক। কোথায়, কোন গন্ধ নেই তো! গন্ধরাজ ফুলের সুতীব্র ঘ্রানের স্মৃতি আছে তিলকের। বাড়ির বাগানে চাঁদের ফটফটে আলোয় সারা গাছ জুড়ে ফুটে থাকত। বাতিহীন সন্ধ্যায় তিলক ছাদে পায়চারি করত এই মাদকতায় ভাসতে ভাসতে। চাঁদের আলো চলকে পড়ত স্তবকে স্তবকে, কোন এক অস্ফুট আকাঙ্খায় তিলক ছটফট করত। অথচ এই ফুলটায় কোন গন্ধ বাকি নেই। এমন গন্ধহীন ফুলের অস্তিত্ব তাকে বিস্মিত করে না দিলে তিলক আরও অবাক হতে পারত। ভাবতে পারত কি করে এলো এই ফুল তার হাতে ? কে রেখে গেল এত রাতে তার বিছানায় ? অ্যামেরিকায় কত রকমের ফুল, এই দেশে আছেও সে বছর কুড়ি। কিন্তু কই গন্ধরাজ চোখে পড়েনি তো কোনকালে।

আলো জ্বালিয়েছ কেন এত রাতে ?

শমিতার ঘুম জড়ানো গলার অস্ফুট বিরক্তি কানে আসতেই ঝটিতি হাতের মুঠো বন্ধ করে দিয়েছিল তিলক, নিজের আঙ্গুলের স্পর্শে ফুলটাকে আলতো ছুঁয়ে। আলো বুঁজিয়েছিল তারও পরে। সমস্ত ঘর অন্ধকার হতেই আসল প্রশ্নটা তার মাথায় নাড়া খেলো। সে কি স্বপ্নের ভিতর থেকে গন্ধরাজ হাতে বেরিয়ে এসেছে ? ভাবতেই গা শিউরে উঠল কেমন। নিজেকে ধমকে উঠল মনে মনে। পাগল হয়েছিস না কি তিলক ? এরকম আবার হয় কখনো ? পাগল শব্দটা নিজের মনের মধ্যেও অস্বস্তিকর। সজোরে সেই ভাবনা ঠেলতে থাকল তিলকের মন। হাতের মুঠোয় ধরে রাখা গন্ধরাজ ফুল তো মিথ্যে নয়। আর একটু জোরে অনুভব করতে গিয়ে ফুলটায় একটু জোরেই চাপ পড়ে গেল। খসে পড়ল একটা পাপড়ি নিজেকে জলজ্যান্ত প্রমাণ করার তাগিদে।

শমিতা আবার ঘুমিয়ে পড়েছে পাশ ফিরে। অন্য ঘরে শায়ন। দূর থেকে ইন্টেরস্টেট ধরে ছুটে যাওয়া রাতজাগা গাড়ির নির্ঘোষ কানে আসছে। এই সবই সত্যি। কিন্তু এই গন্ধহীন গন্ধরাজ, সেও তো মিথ্যা নয়। এই দুই সত্যকে এক জায়গায় মিলাতে না পারার ব্যর্থতায় তিলক চুপিচুপি উঠে গন্ধরাজ ফুলটাকে ড্রেসারের একদম নিচে তার টাইয়ের ড্রয়ারে রেখে দিল। এইসব লুকানোর তাগিদে স্বপ্নটা তখন তার মাথা থেকে নেবে অনেক দূরে চলে গেছে। কেটে যাওয়া ঘুড়ির মত। আওতার বাইরে। সারারাত বিছানায় ছটফট করেও আর সেই ছেঁড়া সুতোর খোঁজ পায়নি তিলক।

সারাদিন এই মনে না পড়া স্বপ্নটা লেপ্টে রইল তিলকের সব কাজের মধ্যে। ফোর্ড রোড থেকে মার্কারি অ্যাভেনিউতে টার্ন নেবার সময় লাল আলোর নিষেধ অগ্রাহ্য করে বেরিয়ে যেতেই প্যাঁ প্যাঁ করে পিছনে পুলিশের গাড়ি এসে দাঁড় করাল লাল নীল হলুদ বাতি জ্বালিয়ে। পুলিস অফিসার এক অ্যাফ্রো-অ্যামেরিকান মহিলা। জানালার কাঁচ নাবাতেই মাথার টুপিটা একটু উঁচুতে তুলে জিজ্ঞেস করল – হোয়াটস আপ স্যার ? ওয়্যার ইউ ড্রীমিং ?

পুলিশের হাতে এই প্রথম নয়। আগেও পড়েছে তো। সেই অভ্যাসে স্টিয়ারিং-এ দুই হাত রেখে কাঁচুমাচু মুখ করে সরি, মাই মিস্টেক এইসব বলার কথা। সেরকম নরম ভাব মুখে রাখতে পারলে ফাইন বেঁচে গেছে দুই একবার। কিন্তু আজ তিলকের দুই হাত কোলের কাছে জড়ো। নিজের অজান্তেই অস্ফুটে উত্তর বেরিয়ে এলো, লুকিং ফর আ লস্ট ড্রীম।

সকাল না হলে নিশ্চয় এবার ওর রক্তে অ্যালকোহলের মাত্রা পরীক্ষা করত। বিরক্তিতে ভ্রু কুঁচকে শুধু বলল, দেন গো ব্যাক টু ইওর বেড অ্যান্ড ডোন্ট রিস্ক আদার্স লাইফ স্যার।

নব্বই ডলারের ফাইনের কাগজটা হাতে দেবার সময়ও বলল, ইফ ইউ আর নট ফীলিং ওয়েল, গো ব্যাক হোম অ্যান্ড টেক রেস্ট, স্যার।

এত রেসপেক্টফুললি ফাইন হাতে গুঁজে দিয়ে গটগট করে চলে গেল, তবু তিলক মন খুলে একটা খিস্তি ভাবতে পারল না। আসলে মনটা একটু ভালও হয়ে আছে। গন্ধ না পাক, গন্ধরাজ ফুলের অস্তিত্ব তার জীবন থেকে ঘুচে গেছিল একদম, আজ আবার ফিরে এসেছে।

অফিসেও কাজে দুই একটা ভুল হল। ওর ম্যানেজার শেলি ফ্র্যান্সিস এমনিতেই খুঁতখুঁতে। নিট পিকার। প্রেজেন্টাশানের ড্রাফট দেখে তিনটে বানান ভুল বের করল বিরক্তির সঙ্গে। যদিও মুখে বিহ্বল করা হাসি টেনে কপাল থেকে সোনালি চুলের গোছা সরাতে সরাতে বলল, থিলাক, তোমার বোধহয় কাজের চাপ খুব বেড়েছে। দুদিন ছুটি নেবে নাকি ?

এরকম খোঁচা মেরে মধুর স্বরে কথা বলার অভ্যাস শেলীর। আগেও শুনেছে আর দ্বিধাগ্রস্ত কাঁচুমাচু গলায় সাফাই গেয়েছে। আজ চ্যালেঞ্জটা হাত বাড়িয়ে টেনে নিল। তুমি ঠিকই বলেছ শেলী, কাজের চাপ বড্ড বেড়ে গেছে। আমি তোমাকে ছুটির কথা বলতেই যাচ্ছিলাম। তিনদিন ছুটি নেবো, ফিরবো সোমবার।

এবার আঁতকে ওঠার পালা শেলীর। মাধুর্যের আস্তরণে ফাটল ধরল এক নিমেষে। হাউ ক্যান ইউ ? সোমবারে গভর্নেন্স কমিটির মিটিং-এ আমাদের প্রেজেন্টেশান, আমরা এখনো তৈরী নই।

আমরা নয়, বলো আমি। তুমি প্রেজেন্ট করবে, নিজে তৈরী হও। এটা অবশ্য মনে মনে আওড়ালো তিলক। চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়িয়ে মুখে বলল, ডাক্তারের অ্যাপয়েন্টমেন্ট করেছি কাল, দেখি কি বলে। পারলে শুক্রবার আসবো অফিসে।

কাঁচের দরজা পেরিয়ে বেরিয়ে আসল যখন, মনটা বেশ ফুরফুরে লাগছিল তিলকের। একটা হালকা গন্ধ ছড়িয়ে পড়ছিল মাথার প্রতিটা কোষে। কিন্তু স্বপ্নটা তখনো মাথায় ফেরেনি। কাফেটারিয়ায় বসে কফিতে চুমুক দিতে দিতে গন্ধরাজের সঙ্গে স্বপ্নের কানেকশান খোঁজার চেষ্টা করছিল। তাদের বাড়ির বাগানে তো অনেক ফুলের গাছ ছিল। দক্ষিণ ধার ধরে কাঠগোলাপ, তার পরে গন্ধরাজ। এর পরেই ছিল শিউলি আর জবা। আর বাড়ির দেওয়াল ঘেঁষে গোলাপ, গাঁদা আর দোপাটির মত ছোট গাছ। পূজোর জন্য রোজ গাছ থেকে একটা করে জবা পেড়ে এনে দিত, কখনো গোটা দুয়েক গাঁদা। শরতকালে মাটিতে বিছিয়ে থাকা শিউলি। আর মা যখন ফুলদানিতে ফুল সাজাত তখন রজনীগন্ধা আর গন্ধরাজ। ঘড়ির দিকে চোখ দিল তিলক। এখনো রাত হয় নি অত, মাকে ফোন করা যায়।

মাকে তো বলা যায় না যে মা আজ ফোন করেছি গন্ধরাজ গাছটার জন্য। কিংবা বলা যায় না, মা আমাদের গন্ধরাজ গাছটা কেমন আছে গো ? এখনো অমনি ফুল হয় ? দুই বছর আগেই বাড়ি গেছিল, হতো তো বেশ। জিজ্ঞেস করলে মা কি অবাক হতে পারে ? ভাববে বাবা মায়ের খোঁজ নেওয়া নেই, ফোন করে গাছের কথা ?

আহা, তা কেন ? তিলক নিজেকে বোঝাতে চাইল। প্রবাসী ছেলে বাড়ির কথা ভেবে এমন প্রশ্ন করলে মা বরং খুশিই হবে। এত বছর বাইরে কাটিয়েও বাড়ির এতসব খুঁটিনাটি তার মাথায় থাকে, এতে তো মা বাবার ভাল লাগার কথা।

কিন্তু তিলকের মনে হচ্ছিল এই গন্ধরাজ ফুলটা বড্ড নিজস্ব। কাউকে ঘুণাক্ষরেও বলা চলবে না। শমিতা শায়নকে বলেনি কিছু। তাই মা বাবাকেও নয়। এইসব সাত পাঁচ ভেবে অনেক দূর থেকে শুরু করেছিল তিলক। বাবাকে বাগানে এই গরমের মধ্যে বেশী কাজ করতে বারণ করো মা। বাগানে ফুল ফুটছে কেমন ? নতুন কোন গাছ লাগিয়েছে বাবা ?

ঠিক তখনই মা বলল, আরে তোকে তো বলাই হয়নি। মিল্টু গাড়ি কিনেছিল জানিস তো।

সেতো কমাস আগের কথা মা।

হ্যাঁ, হ্যাঁ। কিন্তু সামনে বর্ষা আসছে, গাড়িটা রাখার জন্য একটা গ্যারাজ তুলছে মিল্টু।

বা, বেশ ভাল খবর সেটা। তাড়াতাড়ি গন্ধরাজ ফুলে যেতে চাইছিল তিলক যে কোন ভাবে।

যা বলেছিস। এখানে যেরকম চোর ছ্যাঁচোরের উপদ্রব, আমার তো বুক কাঁপত – বাইরে গাড়ি রাখছে। কোনদিন চাকা খুলে নিয়ে না যায়।

তিলক দেখল মা আজ যেভাবে নিজেকে গ্যারেজে পার্ক করে রেখেছে, টেনে বের করা মুশকিল। অগত্যা মাকে উৎসাহ দিতেই ধরতাই দিল, কোনখানটায় তুলছে গ্যারাজটা ?

কোথায় আবার ? গেটের পাশে। ওখানেই তো গ্যারেজের মুখটা হতে হবে, তাই না ?

নিজের অজ্ঞাতেই ককিয়ে উঠল তিলক। ওখানে যে গাছগুলো ছিল ?

এবার মায়ের গলায় দুঃখ ঝরে পড়ল। ওটাই একটু দুঃখের। আমাদের এতদিনকার গন্ধরাজ গাছটা কাটতে হল, কি ফুল যে হত ওই গাছটায়।

আমাকে একবার জিজ্ঞেস করলে না মা ? বুকের মধ্যে ভাংচুর হচ্ছিল তিলকের।

ওমা, তোর আপত্তি ছিল না কি ? মিল্টু আমাকে বলেছিল, একবার দাদাকে জিজ্ঞেস করে নিই গ্যারেজ তোলার আগে। তোর বাবা বরং বলল, তিলু আমার বিষয় সম্পত্তির কচকচিতে যাবেও না কক্ষণো, অত জিজ্ঞেস করাকরির কি আছে ?

তিলক দেখল কথার মোড় অন্যদিকে ঘুরে যাচ্ছে। তাই ঝাঁপিয়ে পড়ে না না করল। আমি গ্যারেজ বানানো নিয়ে বলিনি মা, ওই গাছটার জন্য বলেছিলাম। গন্ধরাজ গাছটা আমার খুব প্রিয় ছিল কি না।

প্রিয়জন হারানোর বেদনা নিয়ে ফোনটা রাখল তিলক। স্বপ্নে কি তাহলে সে ওই গাছটা কাটতেই দেখেছিল ? সেরকম তো মনে পড়ছে না। কিন্তু গাছটা কি মরে যাওয়ার আগে তার হাতে শেষ ফুলটা তুলে দিয়ে গেল ? ভাবতেই গা টা কেমন শিউরে উঠল তিলকের। এটা কি কোন আধিভৌতিক ব্যাপার হচ্ছে ?

গন্ধরাজ মাথায় নিয়ে অন্যমনস্ক থাকছিল তিলক। শমিতা ঠিক খেয়াল করেছে। কি ব্যাপার বলো তো, অফিসে কিছু হয়েছে ?

কই না তো, কি হবে ?

তিলকের এই উত্তরটা এত তাড়াতাড়ি হল যে শমিতা ব্রেকফাস্ট টেবিলের উঁচু টুলটা কাছে টেনে বসল। আমি তোমাকে চিনি, আমায় কিছু লুকাচ্ছ।

কাঁধে শমিতার হাতের হালকা চাপ তিলককে ফাঁফরে ফেলে দিল। এই ব্যাপারটা এমন, শমিতাকে বলতে হবে ভাবলেও কেমন বোকা বোকা লাগছে। ও কি বিশ্বাস করবে ? হয়তো টানতে টানতে নিয়ে যাবে কোন সাইকোলজিস্টের

কাছে। এই দেশে আবার ওই পেশার খুব হাঁকডাক। অথচ শমিতার কাছ থেকে লুকানোও সহজ কাজ নয়। ফট করে বলে দিল, মার সঙ্গে কথা বলছিলাম। মার শরীরটা ভাল নেই, সেটা নিয়েই চিন্তায় আছি একটু।

ওমা, আমি তো কালই মার সঙ্গে কথা বললাম। আমাকে কিছু বলেনি তো। শমিতার ভুরু কুঁচকাল, অভিমান হল একটু। পনেরো বছর তোমাদের বাড়ির বউ, কিন্তু এখনো নিজের করে ভাবতে পারে না।

শমিতা রাগ করে উঠে চলে গেলেও, ফিরে এলো একটু বাদে। শোন, আমি বলি কি তুমি একবার বাড়ির থেকে ঘুরে এসো। সত্তর পেরিয়েছে, কবে কি হয়ে যায়। একবার দেখে এসো।

ধুর, যাবো বললেই কি যাওয়া যায় নাকি ? শেলিকে বললে গুড়ে বালি করে দেবে।

ফ্যামিলি এমারজেন্সী বললে কিচ্ছু বারণ করবে না। তোমার মুখচোখ আমার ভাল লাগছে না একদম। বাড়িতে গিয়ে মায়ের কোলে বসে রেস্ট নাও, দুজনেই সুস্থ হয়ে উঠবে। শব্দে খোঁচার ভাব থাকলেও, শমিতার মুখের হাসি আর চোখের ভাষা বলল সে এটাই চাইছে। তবু তিলক মনস্থির করতে পারছিল না। সেটা ক্ষীণ প্রতিবাদ হয়ে বেরিয়ে এলো গলায়, আমি অসুস্থ হলাম কি করে ? যা তা বললেই হবে ?

জানি গো জানি, সব কথা কি মুখে বলে দিতে হয় ?

শমিতার কথাই থাকল। সাত তাড়াতাড়ি বন্দবস্তো করে বাড়ির পথ ধরল তিলক। এরকম একা একা অনেকদিন বাদে যাওয়া। কুড়ি ঘণ্টার পথে মাথায় কতরকমের ভাবনা যে খেলছিল। মাঝে মাঝে নিজেকে বিশ্বাস করানোর জন্য ল্যাপটপ ব্যাগে জিপলকে রাখা গন্ধরাজটা বের করে দেখছিল। এই ফুলটা সত্যিই যাদুফুল, সতেরো দিন হয়ে গেল, একটুও টসকায় নি। যেন প্লাস্টিকের একদম। কিন্তু সেটাও নয়। ফুলের নরম স্পর্শ হাতে নিয়ে পরখ করেছে বারবার। বেশি টানাটানি করতে ভরসা হয়নি, যদি আবার কোন পাপড়ি খসে পড়ে !

হঠাৎ না বলে কয়ে চলে আসায় বাড়িতে খুব হইচই। মা আহ্লাদে আটখানা। মিল্টু আর ওর বউ পূর্ণাও খুব খুশি। যতদিন আছিস আমার গাড়িটা তোর জন্য রইল দাদা, আমি ড্রাইভার বলে দিচ্ছি। তোর যখন দরকার, যেখানে দরকার নিয়ে যাবে।

এইসব আদর আপ্যায়নে খুশি থাকার কথা। ভালই লাগছিল। কিন্তু গন্ধরাজ ফুলটা মাথায় পাকাপাকি বাসা বেঁধেছে। সেটা তাড়ায় কি করে। কাউকে বলতে পারলে হয়তো হালকা হত একটু। চা খেতে খেতে মাকে জিজ্ঞেস করল, মা বাবার সেই এক ঠাকুরদা কালী পূজা শুরু করেছিল, ছোটবেলায় গল্প করতে।

তোর বাবার রাঙ্গাদাদু? তোর মনে আছে তার কথা এখনো? খুব ভাল শ্যামা সঙ্গীত গাইতেন। তুই তো দেখিসও নি জ্ঞানত কালে।

হ্যাঁ কিন্তু তুমি ছোটবেলায় গল্প করতে উনি নাকি স্বপ্নে কালীর আদেশ পেয়েছিলেন –

মার মুখে কেমন একটা তৃপ্তির হাসি খেলে গেল। সে আমাদের পরিবারের মধ্যে এক গল্পকথা। একদিন মাঝরাতে উঠে রাঙ্গা দাদুর কি হাঁকডাক। স্বপ্নে কালীমাকে দেখেছেন, ঘুম থেকে উঠে দেখেন হাতে একটা টকটকে লাল জবা।

তুমি দেখেছিলে মা ? সত্যিকারের জবা ? স্বপ্নে থেকে হাতে চলে এলো না কি হাতে নিয়েই ঘুমিয়েছিলেন ?

রাঙ্গাদাদু তো বলেন মা কালী নিজের হাতে দিয়েছেন। প্রতিমা কপালে একবার হাত ছুঁইয়ে নিতে ভোলেন না। আমি তখন বাড়িতে নতুন বউ, উনি বয়স্ক মানুষ। অত কি আর জিজ্ঞেস করতে পারি ? তবে সেই থেকেই আমাদের বাড়িতে কালিপুজার চল। তুই তো আর আসিসও না কত বছর, সবাই তোর কথা জিজ্ঞেস করে।

মা কথাটাকে অন্যদিকে নিয়ে যাচ্ছে। তিলক তাড়তাড়ি নিজের কথায় চলে এলো। তুমি বিশ্বাস করতে মা ?

কি বিশ্বাস করবো ?

ওই স্বপ্নে ফুল হাতে পাওয়া –

প্রতিমা অবাক হয়ে তাকাল তিলকের দিকে। হঠাৎ এরকম কথা কেন রে তিলু? বিশ্বাস করলেই বিশ্বাস।

বাবা পাশের ঘরে খবরের কাগজ পড়ছিল। উঠে এলো। ধুর, যতসব বানানো গল্প। রাঙ্গা দাদুর অনেকদিন ধরে বাড়িতে কালিপূজা করার ইচ্ছা, তাই নিজেই এরকম গল্প ফেঁদেছিল। আমি চিনিনা আমার দাদুকে ?

তুমি একটু চুপ করো তো। ঠাকুর দেবতায় বিশ্বাস নেই তোমার, তুমি উড়িয়ে দিতে পারো, আমরা পারি না।

নিজের গন্ধরাজ ফুল পাওয়ার গল্পটা বলি বলি করেও মুখে আনতে পারল না তিলক। তার বদলে জিজ্ঞেস করল, আমাদের কাছাকাছি আর কারো বাড়িতে গন্ধরাজ ফুলের গাছ আছে মা ?

ছেলের মুখে গন্ধরাজ গাছ কাটার দুঃখের কথা জানার পর থেকে প্রতিমা মরমে মরে আছে। তাই এদিক ওদিক খোঁজ নিয়ে বিকেল বেলায় বলল, তোর গন্ধরাজ ফুলের এত শখ তিলু। আমি খোঁজ নিলাম, আমাদের পাশের বাড়ির মৌমিতার বাপের বাড়ি কোন্নগরে। ওর বাড়িতে দুটো গাছ আছে, অনেক ফুল ধরে। এই সপ্তাহে ও বাপের বাড়ি যাচ্ছে, তোর জন্য কটা ফুল নিয়ে আসবে খন।

তিলকের তো ইচ্ছা হচ্ছিল নিজেই দৌড়ে চলে যায় একবার। কিন্তু সেটা বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে। আরও দুদিন গেলে রবিবার, থাকল ধৈর্য ধরে।

মা যখন হাসিমুখে তোড়া পাকান গন্ধরাজের গোছা হাতে দিল, কেমন বিহ্বল হয়ে গেল তিলক। সেই গন্ধ। ছোটবেলার গন্ধ। তার স্বপ্নে পাওয়া গন্ধ। নাকের কাছে ধরতেই মাথার কোষে কোষে চারিয়ে যাচ্ছিল একদম। বিশ্বজয়ের হাসি নিয়ে মা ঘর ছাড়তেই তড়িঘড়ি দরজাটা ভেজিয়ে দিল তিলক। ল্যাপ টপ ব্যাগ থেকে বের করল নিজের গন্ধরাজ ফুলটা। হুবহু। শুধু তার ফুলটা এখনো ফটফটে সাদা, এই ফুলগুলোতে এর মধ্যেই একটু লালচে ভাব এসে গেছে। আর অবশ্যই গন্ধ। তার ফুল গন্ধহীন, আর এই গন্ধরাজে প্রাণকাড়া সুবাস।

গন্ধরাজ নিয়ে তার এতো মাতামাতি দেখে মিল্টুর বউ পূর্ণা বলল, দাদা তুমি গন্ধরাজের একটা কলম করিয়ে নিয়ে যাও। নিজের বাগানে কেমন সুন্দর ফুটে থাকবে। তোমার পিওনি আর ড্যাফোডিলের মাঝখানে রাজার মত।

হ্যাঁ, দাদা নিয়ে যাক আর কাস্টমসে ধরুক আর কি। কোন গাছ পাতা এক দেশ থেকে আরেক দেশে নিয়ে যাওয়া অত সহজ কাজ নয়। জেলেও পুরে দিতে পারে।

মিল্টুর কথাটা সত্যি। তাছাড়া কাগজপত্র তৈরী করে নিয়ে গেলেও মিশিগানের ওয়েদারে বাঁচাতে পারবে সে ভরসা নেই। ভাবতে ভাবতে হঠাৎ একটা ঘটনা মনে পড়ে গেল। কলেজে পড়ার সময় পাঁচটা বত্রিশের বর্ধমান লোকাল ধরত তিলক। বালি স্টেশান ছাড়ালেই ফুলের তোড়া শুধু এক টাকা, ফুলের তোড়া শুধু এক টাকা বলে হাঁকতে হাঁকতে উঠত লোকটা। কামরায় পা রাখার জায়গা হলেই লাল দাঁত বের করে হাসত ধুতি আর বুশ শার্ট পড়া মধ্যবয়সী হকার। বোতলবন্দী ফুলের তোড়া, শুধু এক টাকা। বেলী, রজনীগন্ধা, গন্ধরাজ – বিয়েবাড়িতে যাওয়ার আগে পাঞ্জাবির হাতায় শুধু এক ফোঁটা। সোজা ছাদনাতলায় নিয়ে বসিয়ে দেবে। বাড়ি গিয়ে বউয়ের হাতে একটা শিশি ধরিয়ে দিন, ফুল কেনার আর হ্যাপা নেই। শুধু এক টাকা, শুধু এক টাকা। এরপর লোকটা ঘুরে ঘুরে স্প্রে করত যাত্রীদের নাকের সামনে, সারা কামরা ফুলের গন্ধে ভরে উঠত। তিলক কোনদিন কেনেনি, কিন্তু লোকটার বলার ভঙ্গী এরকম মজার ছিল, মাথার কোনে গেঁথে গিয়েছিল। এখনো কি আছে লোকটা, ট্রেনের কামরায় ঘোরে বোতলবন্দী ফুলের গন্ধওয়ালা আতর নিয়ে ?

গাড়ি না নিয়েই বেরিয়ে পড়ল তিলক।

একি রে, এই সময় কোথায় চললি তিলু ? গাড়ি নিবি না ? তিলককে জামাকাপড় বদলাতে দেখে প্রতিমা চা হাতে নিয়ে এসে দাঁড়াল।

এখন চা খাবো না মা, দেরী হয়ে যাবে।

কিসের দেরী হয়ে যাবে প্রশ্নের উত্তর না দিয়েই হনহন করে বেরিয়ে পড়ল। কি যে এক অমোঘ টানে চলেছে তিলক !

ট্রেনে করে হাওড়া স্টেশানে পৌঁছাল তখন চারটে চল্লিশ। কতদিন বাদে হাওড়া স্টেশানে এলো। দেশে থাকতে রোজই আসতে হত। এখন শুধুই এয়ারপোর্ট আর গাড়ি, এদিকে পা পড়ে না। মাথার মধ্যে গন্ধরাজ না ঘুরলে এই অভিজ্ঞতাটা আরো গভীরভাবে নিতে পারত। এ যেন ডোডো পাখির খোঁজে ঘুরে বেড়ানোর মত। ওই ট্রেনটা থাকতে হবে, সেই লোকটা এখনো ফিরি করে বেড়াবে আর উঠবেও তার কামরায় – এত কিছু মেলানো খুব মুশকিল। তবু লোকের ধাক্কা খেতে খেতে বড় ঘড়ির পাশে লম্বা সময় সারনীর সামনে এসে পড়ল। ট্রেনের তালিকা দেখে খুব ধন্দে পড়ে গেল। পাঁচটা একুশে একটা বর্ধমান লোকাল, আবার পাঁচটা আটচল্লিশে। অথচ বত্রিশের ট্রেনটা আর নেই। কি করবে এখন তিলক ?

ভাবছে কি করবে এমন সময় চমক লাগার মত কান এলো – বোতলবন্দী ফুলের তোড়া, শুধু দশ টাকা। রজনীগন্ধা, বেলী, গন্ধরাজ ! প্ল্যাটফর্মেই ! শব্দ লক্ষ্য করে প্রায় উর্ধশ্বাসে ছুটল তিলক। একটা লোকের পা মাড়াতেই হেই হেই করে তেড়ে এলো মারতে। তিলকের সেদিকে নজর থাকলে তবে না। ভিড় ঠেলে পৌঁছাতেই একেবারে সেই লোক, শুধু চুলে পাক, মুখে খোঁচা দাড়ি – আর বাঁ বগলে ক্রাচ। কাঁধে সাদা চটের ব্যাগ, হাতে একগোছা আতরের শিশি। মা জননীর জন্যে এক শিশি নিয়ে গেলে ফুল কেনার ঝক্কি শেষ দাদারা, ভাইয়েরা, ছেলেরা। একবার টেরাই করে দেখুন। লটারীর টিকেট পাওয়ার আনন্দ নিয়ে তিলক তার সামনে এসে দাঁড়াল। গন্ধরাজ আছে ?

একেবারে গাছ থেকে পেড়ে এনেছি ভাইটি, কটা চাই ?

ঠিক ফুলের গন্ধ হবে তো ?

একগাল হেসে লোকটা একটা শিশি বেছে নিয়ে খুব কষে ঝাঁকি দিল। শিশির মাথার লাল রাবারের ক্যাপ খুলে হাত বাড়িয়ে দিল, জামার হাতাটা দ্যান দেখি একবার। হাতায় লাগিয়ে আবার হাসি। শুঁকে দেখুন, একেবারে সেম টু সেম।

কোন্নগর থেকে আনা গন্ধরাজের সঙ্গে মনে মনে মিলাতে চেষ্টা করল। বেশ সেরকমই তো। কতক্ষণ থাকবে এই গন্ধ ?

ধোপার বাড়ি জামা না পাঠালে এই গন্ধ যাওয়ার নয় রে ভাইটি।

অত কিছু জেনে কাজ নেই তিলকের। কোন দোকানে গন্ধরাজ ফুলের পারফিউম রাখে না। সুতরাং এই লোকটাই ভরসা। গন্ধরাজের শিশি কতগুলো আছে ?

লোকটা এমন প্রশ্নে খুব অবাক হল। তারপরেই চোখ চকচক করে বলল, অনেক কটা চাই নাকি বাপধন ? আমার বেলী, রজনীগন্ধার আতরও খুব ভাল, নেবা নাকি ?

না, না শুধু গন্ধরাজ।

লোকটার কাছ থেকে বাইশটা গন্ধরাজের শিশি কিনে ওর অবাক হাতে পাঁচশো টাকার নোট ধরিয়ে উল্টো পথ ধরল তিলক। খানিক পরে খেয়াল হল, আরে ওর হদিশটা নিয়ে রাখলে হত। যদি পরে আরও নিতে হয়। কিন্তু ঘাড় ঘুরিয়ে আবার যখন তাকাল, সেই লোকটা হাওড়া স্টেশানের ভিড়ে মিলিয়ে গেছে।

বাড়ি ফিরে নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করে জিপলক খুলে ফুলটা বের করল। একটা শিশি খুলে বেশ খানিকটা আতর ছড়িয়ে দিল ফুলের উপরে। সারা ঘরটা এখন গন্ধরাজের গন্ধে ম ম। ফুল একটা, গন্ধ এক গাছ ফুলের।

বাকি দিনগুলো বেশ ফুরফুরে আনন্দে কাটিয়ে মিশিগানে ফিরে এলো তিলক। ওকে দেখে শমিতার চোখ কৌতুকে চকচক। মায়ের আদরে বুড়ো ছেলের ভোল যে একেবারে বদলে গেছে দেখছি !

সুটকেস নাবিয়ে অনাবিল হাসি তিলকের। দেখবে একটা জিনিস ?

তিলক মাঝে মাঝেই সারপ্রাইজ দেওয়ার জন্য শমিতার জন্য এটা ওটা নিয়ে আসে, বিশেষ করে কয়েকদিন বাড়ির বাইরে থাকলে তো বটেই। তিলকের পছন্দে শমিতার বেশী ভরসা নেই, ভয়ে ভয়ে থাকে যেন বেশী দামী কিছু না কিনে আনে। গয়না তো একেবারেই নয়। ওটা নিজের পছন্দেরই ভাল। তবু হাসি হাসি ভাব মুখে ধরে রেখে বলল, কি এনেছো ? দেখাও, দেখাও !

হাসিটা আরও ছড়াল তিলকের মুখে, আগে চোখ বোঁজো।

অবাক হবার প্রতীক্ষায় চোখ বুঁজে থাকা শমিতাকে দেখতে দেখতে ব্যাগ হাতড়ে জিপলক থেকে গন্ধরাজটা আলগোছে বার করল তিলক, বাড়িয়ে ধরল শমিতার নাকের সামনে। সত্যিই অবাক হল শমিতা। ওমা, কি মিষ্টি গন্ধ ! তোমাদের বাড়ির গাছটার ? তোমাদের ওখানে গেলেই ওর গন্ধে আমার কি ভাল যে লাগত। বলতে বলতে থমকে গেল শমিতা। তুমি এত দূর থেকে এলে। অথচ ফুলটা এখনো কেমন টাটকা ! আর কি চমতকার গন্ধ।

তিলক গন্ধ রহস্যটা আর ভাঙ্গল না। হাসি হাসি মুখে ফুলটা জিপলকে ঢুকিয়ে বলল, জীবনের বিশেষ কিছু, কোনদিন ফুরায় না।

বুঝতে না পেরে ভ্রু কুঁচকাল শমিতা। মানে ?

আলটপকা বলে দেওয়া কথাটাকে ঢাকতে তিলক তাড়তাড়ি শমিতাকে দুই হাতের বেড়ে টেনে নিল, মানে যেমন তোমার আর আমার ভালবাসা, শুকাতে দেবো কোনদিন ? তেমনি এই গন্ধরাজ। চির সজীব, চির নবীন।

ন্যাকা, ঢং করো না এতো ! দেশ ঘুরে আসার আনন্দে ভালবাসা একেবারে উথলে পড়ছে।

শায়নকে ডাকো, ও কোথায় ? একবার দেশের ফুলের গন্ধ নিক। হাঁক ডাক করতে করতে শায়নের শোবার ঘর মুখে চলল এবার। বিদেশে বড় হচ্ছে ছেলেটা, সবসময়ে ওকে দেশের সঙ্গে নানানভাবে পরিচয় করানোর সুযোগ খোঁজে তিলক।

অনেক স্বপ্নবিহীন রাতের পরে আবার একটা স্বপ্ন এলো সেদিন। নীরব অন্ধকারে জেগে উঠল অসম্ভব ভাল লাগাময় বিষন্নতা নিয়ে। ঘুম ভাঙতে হাতে পেল একটা পাখির পালক। আঙ্গুলের স্পর্শে পালকের কোমলতা পরখ করতে করতে এবার আর চমকায় নি তিলক। তাদের পেয়ারা গাছে টিয়া পাখি আসত ছোটবেলায়। মাঝে মাঝে ছেড়ে যেতো ওদের সবুজ পালক। ঘন সবুজ, তেল চকচকে। স্নানের পরে পেতে আঁচড়ান চুলের মত নিবিড়। কুড়িয়ে পেয়ে ভূগোলের বইয়ের ফাঁকে রেখে দিয়েছিল। আলো না জ্বালিয়েও তিলক মনে মনে নিশ্চিত এই পালকের রং সবুজ। যদি সেটা না হয়, তাহলে সবুজ রং লাগিয়ে নিতে হবে।

বিশ্বদীপ চক্রবর্তী — পেশায় ইঞ্জিনীয়ার, নেশায় লেখক। প্রধানত গল্পকার, ইদানীং নাটকও লিখছেন। গল্প প্রকাশিত হয়েছে দেশ, বর্তমান, সানন্দা, কথা সোপান, দুকুল এবং আরও পত্রপত্রিকায়, এবার বাতায়নে। মঞ্চসফল নাটক 'রণাঙ্গন' — এই বছরে বেশ কয়েকবার মঞ্চে এসেছে। ধারাবাহিক উপন্যাস 'হাগা সাহেবের ট্রেন' প্রকাশ পাচ্ছে 'অন্যদেশ' ওয়েবজিনে। থাকেন অ্যান আরবার, মিশিগানে।

জয়ন্তী বন্দ্যোপাধ্যায়

বিদেশিনী-২

গরমের লম্বা ছুটি। বোনঝি কেটলিনেরও, আমারও। নিউ হ্যাম্পশায়ারের বাসিন্দা হাইস্কুলের ছাত্রী কেটি অন্যান্য সময় এত ব্যস্ত পড়াশুনা, জিমনাস্টিক্স, চিয়ারলিডিং এবং আরও কত-কি নিয়ে, যে মাসী-মামাদের কথা ভাবার সময় নেই তার কাছে। কিন্তু এবারের এই ছুটিটাতে সে আমাকে সময় দিতে পেরেছে। আর কিছু না হোক, ওর একটা প্রজেক্ট লেখার খাতিরে ই-পত্রের লেনদেন বেশ প্রতিনিয়ত চলছে।

তার প্রশ্নের শেষ নেই। আমার ই-পত্রের (হটমেল) চাবি খুললেই দেখি কেটি আমায় ডাকছে উত্তর দেবার জন্য। প্রথম দিকের প্রশ্নগুলো ছিল সহজের দিকে — শাড়ি আর লেহঙ্গার মধ্যে তফাৎ কী; কলকাতার বয়স কত; নামের উৎপত্তি কোথায়; গঙ্গা আর ব্রহ্মপুত্রের নাম আলাদা কেন; কেন একটা নদীকে মেয়ে/মা ভাবা হয় এবং আর একটিকে ছেলে; এসবের মানে কী — আরও কত কি ! হয়ত বা কেটি ভেবেছে যে নিজে গবেষণা করতে যত না সময় লাগবে, তার থেকে অনেক সোজা হবে মাসীকে চটপট একটি মেল পাঠিয়ে জেনে নেওয়া। ভাগ্যিস সে জানে না যে তার এই মাসীটিও গুগল আর উইকিপিডিয়ার দরজাতেই ঘা মারছে ! ভগবান ই-গবেষণা কেন্দ্রদুটিকে দীর্ঘজীবি করুন। যদিও আমি এখনও ঠিক বুঝে উঠতে পারিনি ওর প্রজেক্টের উদ্দেশ্যটা কী এবং কোথায় এর শেষ, তবে আমার বাঙালি-আমেরিকান বোনঝির ই-সান্নিধ্য বড়ই উপভোগ করছি এই দুটো মাস।

চলছিল ভালই। সেদিন আমার কেটলিনের সাথে চোখাচুখি দেখা। সে তার অলিভ রং আর ডার্ক ব্রাউন সিল্কের মত চুল নিয়ে বড়ই অনন্য সাধারণ রকমের রূপসী হয়ে উঠেছে।

হঠাৎ তার সোজাসুজি প্রশ্ন, 'মা-সী-, হোয়াট ডাজ বিদেশিনী মীন ? হোয়াই আর ইউ বিদেশিনী অন ইওর হটমেল অ্যাড্রেস ? তুমি বিদেশিনী কেন ? তোমার নাম তো তা নয় !'

কেটির সম্বোধনটা একেবারে পরিষ্কার বাংলা উচ্চারণে। তবে বাংলাতে ওর দৌড় ওইটুকুই। প্রশ্নটা বড়ই ভাবিয়ে তুললে আমায় — এর উত্তর তো গুগলের পক্ষে দেওয়া সম্ভব নয়। তাহলে কি করি ? নিজের অন্বেষণে পা বাড়াই তাহলে ? কবে, কিভাবে এবং কেন বিদেশিনীকে বেছে নিয়েছিলাম তা কি মনে আছে . . . . ? রবীন্দ্রনাথ লিখতেই পারেন, 'চিনি গো চিনি তোমারে, ওগো বিদেশিনী' — কিন্তু আমি সত্যিই কি চিনি আমাকে ? যাব, অতল জলের আহ্বানে ?

বেহালার পর্ণশ্রীতে ভাড়া নেওয়া ছোট্ট বাড়িটার দোতলার বারান্দায় বসে ডিসেম্বরের নরম রোদ্দুর উপভোগ করতে করতে চা খাচ্ছিলাম। আসলে এই চা খাওয়াটাই কিছুটা অভ্যেসের বাইরে আমার। বিশাল বিশাল মাগে পাঁচ-ছবার করে ভ্যানিলা ক্রীম বা হেজেলনাট ক্রীম ফ্লেভারের কফি খাওয়াটাই বেশি পছন্দ। কিন্তু এটা তো আমেরিকার বস্টন নয়। তাই দার্জিলিংয়ের চা পান করাটাই রোজকার রুটিন করে নিয়েছি। সামনের পুকুরটা, চারপাশের সবুজ গাছপালা, উল্টোদিকের বাড়িগুলো — সব মিলিয়ে দেখে বেশ ভাল লাগছিল। হঠাৎ দেখি আমার ড্রাইভার মোহন হন্তদন্ত হয়ে মুখে একটা বিব্রত ত্রাস্তভাব নিয়ে এইদিকেই আসছে। আজ তো ওকে ছুটি দিয়ে দিয়েছি ! কি হল ? এইরকম আবার হয় না কি ? দিদির প্রতি ওর এতখানি কর্তব্যনিষ্ঠা ? একটু ঘাবড়েই গেলাম।

বললাম, 'কি হল, মোহন ?'

মোহন চোখ বড় বড় করে আমাকে জানাল, 'দিদি, গতকাল রাত্রে গাড়িটা গ্যারেজ করে বাসস্ট্যান্ডে হেঁটে যাবার সময় একটা কান্ড হয়েছে। ভীষণ ভয় পেয়ে গেছি, আপনার জন্য।'

আমি তাকে শান্ত করি কোনরকমে, 'বোসো তো, জলটল খাও, এবার বলো, কি হয়েছে।'

এবার মোহন বলে ফেলল, 'দিদি, ওই উলটোদিকের বাড়ির লোকটা আমাকে রাস্তায় ধরে বলল যে তোমার দিদির বাড়িতে এত লোক কেন আসে প্রতি রবিবার ? এসব ব্যাপারে এ পাড়ার ক্লাবের ছেলেরা পছন্দ করবে না। উনি এখানে একা মহিলা, তার বাড়িতে লোক আসবে কেন এত ? দিদি, আমি সত্যি বেশ ভয় পেয়ে গেছি একথা শুনে।'

আমি তাকে আশ্বাস দিলাম, 'তোমার কোন ভয় নেই, তুমি বাড়ি যাও, আমি দেখছি।'

মোহনের বর্ণনা শুনে এটুকু বুঝেছিলাম যে এর একটা বোঝাপড়া এই মুহূর্তেই করা দরকার। পায়ে চটিটা গলিয়ে আমার প্রতিবেশীর সঙ্গে আলাপটা সারতে চললাম যা আরো অনেক আগেই করা উচিত ছিল। দরজায় ধাক্কা দিতেই ভদ্রলোকটি বেরিয়ে এলেন প্রায় অর্দ্ধ উলঙ্গ অবস্থায় একটি তোয়ালে জড়িয়ে এবং আমাকে দেখেই টুক করে ভেতরে পালালেন। যাঁর নাকি সমাজ নিয়ে এত চিন্তা, তাঁর কি না এই বেশ ! যাইহোক, মিনিট কয়েক পরে জামাকাপড় পরে তিনি আবার বেরিয়ে এলে আমি আর কোন সময় নষ্ট না করে মিষ্টি হেসে আরম্ভ করলাম,

'নমস্কার, আমি আপনার নতুন প্রতিবেশী, আমেরিকাতে অধ্যাপনা করি। এখানে এসেছি একটি বিশেষ প্রজেক্ট করতে এক বছরের ছুটি নিয়ে। আপনার সাথে আলাপ করতে এলাম। শুনলাম যে আপনার অনেক প্রশ্ন আছে আমার কার্জকলাপ সম্পর্কে ! বলুন, কি জানতে চান।'

বেচারা ভদ্রলোকের ভ্যাবাচাকা মুখের চেহারা দেখে কোনরকমে আমি হাসি চাপার চেষ্টা করছি, তখন তিনি আমতা আমতা করছেন,

'না, ম্-মানে, আ-আমি না, ওই ক্লাবের ছেলেগুলো জানতে চাইছিল কি না, তাই।'

'আচ্ছা, তাঁদের বলবেন যে কোন প্রশ্ন থাকলে তারা নির্দ্বিধায় আমার কাছে আসতে পারেন — আমার জানাতে কোন বাধা নেই যে আমি একটি ছবি প্রযোজনা করছি আপনাদের এই টালিগঞ্জে। আজ তাহলে চলি, নমস্কার।' আর কোনদিকে না তাকিয়ে গটগট করে ফিরলাম নিজের ডেরায়। কিন্তু সেই মুহূর্তে আমার অতি আপন কলকাতার মাটিতে দাঁড়িয়ে নিজেকে বড় বেশি করে বিদেশিনী মনে হয়েছিল।

আর একদিনের কথা যে না লিখলেই নয় ! গিয়েছি পর্ণশ্রীর ডাকঘরে সরকারকে আমার এক বছরের অবস্থিতির জানান দিতে। সালোয়ার কামিজ আর চটি পায়ে গিয়ে নির্ভেজাল বাংলায় আমার আর্জি পেশ করলাম। কালো চশমা পরা ভদ্রলোক আড়চোখে আমাকে দেখেই পাশের কাউন্টারে যেতে বললেন। গেলাম। এখানে আছেন একজন দাড়িওয়ালা কেরানী। তিনি পান চিবোতে চিবোতে আমাকে বললেন আবার ওই কর্মচারীর কাছে একটু আগেই আবেদন জানিয়েছিলাম। বুঝলাম যে আমার এই মেথডটা বদলান দরকার। আমেরিকায় ক্লাসে ছাত্রদের তো সর্বদাই বলে থাকি যে ম্যানেজমেন্ট ফিলডে সবচেয়ে বড় ফয়সালা হল পুরোন প্রণালী বদলে নতুন পথে চলার।

তাই এবার মাতৃভাষা ছেড়ে বিদেশী ভাষায় আমেরিকান উচ্চরণে ঘোষণা করলাম, 'কেউ কি আছেন এখানে যিনি আমার এই সামান্য আবেদনটি শুনতে এবং আমাকে সাহায্য করতে রাজি ? আমি এখানে নতুন, বিদেশিনী।'

তক্ষুনি একজন সুশ্রী তরুনী উঠে দাঁড়িয়ে আমাকে তাঁর ডেস্কের কাছে ডাকলেন এবং রীতিমত আপ্যায়ন করে আমায় সাহায্য করলেন। চারপাশের পুরুষ কর্মীরা তখন একেবারে চুপ। সেদিন ওই বিদেশিনীর পরিচয় দিয়ে অনেক লাভ হয়েছিল ঠিকই তবু মনটা ভারি হয়েছিল ইংরেজি ব্যবহার করতে বাধ্য হতে হল বলে। কিন্তু কী অদ্ভুত ব্যাপার, কিছুদিন বাদে এই কলকাতারই এক বিখ্যাত চিত্র পরিচালক আমাকে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন যে সত্যিই কি আমি ইংরেজিতে আমেরিকাতে লেকচার দিই না স্রেফ বানিয়ে বলছি। আমার নামটা যদি দেবিকা না হয়ে দেবীচরণ হত, তাহলে বোধ করি এই ধরণের প্রশ্ন তাঁর মাথাতেই আসত না। আমি অবশ্য তাঁর অহেতুক চ্যালেঞ্জটা আসলে প্রশংসা বলে ধরে নিয়েছিলাম কেননা এতটা বাঙালিত্ব বজায় রাখতে পেরেছিলাম বলে।

ক্ষণস্থায়ী হবার উপরি পাওনাটা কিন্তু পেয়েছিলাম নবপরিচয়লব্ধ মাসিমাদের কাছ থেকে। সবদেশের মায়েরা একেবারে এক। হঠাৎ হঠাৎ টেলিফোনে তাঁদের মধ্যে এক একজন ডাক দিতেন,

'কি করছ বসে বসে একা ? নিশ্চয়ই নিজের জন্য শুকনো পাঁউরুটি টোস্ট ছাড়া আর কিছু কর নি ! শীগগির চলে এস,

কাঁঠালের বীচি দিয়ে ভাজা মুগের ডাল, পাঁপর, পোস্তর বড়া, আর মোচার ঘন্ট করেছি।' আমাকে নিজের মেয়ের মত আদর করে খাইয়ে তাঁদের সে কী তৃপ্তি !

কি দেখছি তাহলে মনের আয়নাতে — আমার এই বিদেশীনীর ছদ্মবেশ কি শুধুই একজ্‌টিক হবার জন্য ? ওই যেরকম করে নীল বা লাল পাখিরা গাছে অল্পক্ষণের জন্য এসে বসে ! ভোলাই যায় না তাদের। আমার ছেলে তো ছোটবেলা তার ঘরের জানালা দিয়ে তাকিয়ে থাকত আর বলত,

'মা, কবে আসবে ব্লু জে আর রেড কার্ডিনাল্ ? '

সেই পাখিদের মতই এবার উড়ে এসে বসেছি ভিন চীনদেশে স্বামীর অ্যাসাইনমেন্টের কল্যাণে ! তিনজন চীনদেশী মেয়ে এসেছে আমাদের অ্যাপার্টমেন্ট পরিষ্কার করতে। তারা মিষ্টি, এবং আমার কাছে বিদেশিনী, এক্‌জটিক। খুব মন দিয়ে কাজ করছে ওরা। পুরোনো পাগলামিটা আবার পেয়ে বসল আমায়। ওদের সাথে আলাপ করতেই হবে। কিন্তু মহা মুস্কিলে পড়া গেল ভাষা নিয়ে। আমি চাই ওদের নাম জানতে। পৃথিবীর অনেক ভাষাতে এই 'নাম' শব্দটা একটু রকমফের করলেই অন্ততঃ বোঝা যায়। কিন্তু চীনা ভাষায় নয়। আমি বারবার নিজের বুকের উপর হাত দিয়ে বলে যাচ্ছি ইংরেজিতে (যেন ওরা ইংরেজি বুঝবে ! বাংলাতে বললেও কোন ফারাক হত না)

'আমি দেবিকা, তোমাদের নাম ?'

তারা আমার বুকের ওপরে ঝোলা নেকলেসের চীনা অনুবাদ করে দিল। তারপর আমার মুখের অবস্থা দেখে কী খিলখিল হাসি ওদের ! বিদেশিনী হবার দায়টা আবার আমায় জানান দিল। যাক, বাব্বাঃ, এতদিনে তাহলে খুঁটিটা খুঁজে পাওয়া গেল — আমি অনাবাসী ভারতীয়, আমেরিকা আমার দেশ।

কিন্তু, না ! সেদিন আমার কলেজের এক আমেরিকান ছাত্র লুইস্ শেকড়টা ধরে আরও একবার নাড়া দিল। ভারতবর্ষ আমার লেকচারে ওইদিন বেশ ভালরকম প্রাধান্য নিয়েছিল।

সে হঠাৎ মন্তব্য করে বসল, 'প্রফেসর, আপনি ভারতবর্ষের কলেজে পড়ান না কেন ?'

তবে ? লুইস্-এর কি মনে হয়েছে যে আমেরিকার নাগরিক হলেও আমি বিদেশিনী ? আমি কে তাহলে ? কোথায় আমার ঘর ? ক্লজেট ভর্তি শাড়ি, এন আর আই, নিউ মার্কেট, এই কি আমার হদিশ ? কী উত্তর দেব যখন কালীঘাটের রাস্তায় শোওয়া বুভুক্ষু শিশুরা জীবনের মানে জানতে আসবে ? কী বলব আমি তাদের ? এটাই ভবিতব্য এটাই হয়ে থাকে ? মেনে নাও তোমরা ?

'মা-সী-, টেল মি, হোয়াই ? বললে না তো কেন বিদেশিনী তুমি?'

কেটির সুরেলা গলার শব্দে ধড়ফড়িয়ে উঠে বসি ! এইসব তাহলে অবচেতন মনের খেলা ? কখন ঘুমিয়ে পড়েছি, সামনে খোলা 'আবোল তাবোল', সঞ্চয়িতার পাতায় বিদেশিনী' আর সিডি-প্লেয়ারে বাজছে, 'মন চল নিজ নিকেতনে।' আচ্ছা, নরেন্দ্রনাথ কি শুধিয়েছিলেন নিজেকে, কেন ঘুড়ে বেড়াচ্ছি এই সংসারে বিদেশির বেশে ?

তন্দ্রার শেষ আমেজটা কেটে গেল আমার অনুসন্ধিৎসু বোনঝিটির মৃদু ঝাঁকানিতে,

'মা-সী-, ওয়েক আপ ! লিস্ন, ক্যান আই বি বিদেশিনী-টু ? আমি বিদেশিনী-২ হতে পারি ?' উঃ কেটলিন, মাসীর কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে এই অস্থিরতা আর পাগলামির দোষটা কি না পেলেই চলছিল না তোর ?

Dr. Jayanti Bandyopadhyay – is a Professor of Accounting and the Graduate Program Coordinator at the Bertolon School of Business at Salem State University in Salem, Massachusetts. Her research interests include internationalization of accounting services, tax and international accounting issues, case studies, micro-financing, and measuring the impact of investment in bottom of the pyramid segments.

Jayanti co-founded SETU (Stage Ensemble Theatre Unit), a not-for-profit English theatre group portraying Indian origin plays in English in Boston, Massachusetts. She loves to write stories occasionally and is a passionate cook. She was born in Kolkata, India. She currently lives in Boston with her husband, Gautam. She has five grandchildren between the ages of 6 months to five years who are the fuel for her other passion in life.

কল্যাণী রমা

ছিটা রুটি

শীতের দুপুর। পাশের বাড়ির কেয়াদের বাসা থেকে খেয়ে এসেছি লালশাকের সাথে দেওয়া চিংড়িমাছ। এমনিতেই লালশাক আমার খুব প্রিয়। খেলেই হাত কেমন লাল হয়ে যায়! জীবনের ভিতর লুকিয়ে থাকা আনন্দের মত। সব ফুঁড়ে বেরিয়ে আসে। দিদাকে এসে এই আশ্চর্য খাবারের কথা বললাম। দিদা বলল, 'হুঁম'। বুঝতে পারলাম আমাদের বাড়ি কোনদিন চিংড়িমাছ দিয়ে, পিঁয়াজ দিয়ে, লালশাক রান্না হবে না। যেমন কোনদিন আমাদের বাড়িতে রান্না হয়নি আমার খুব প্রিয় লাচ্ছা সেমাই, জর্দা সেমাই, দুধ সেমাই, কমলালেবু দেওয়া জর্দা পোলাও, কোন ধরনের কাবাব কিংবা টুকরো টুকরো ক'রে কাটা খাসির মাংস দিয়ে বুটের ডাল। অবশ্য খুব রান্না হয়েছে কিশমিস দেওয়া পায়েস, নারকেল দিয়ে ছোলার ডাল – এমন কি পুঁইশাক বা মিষ্টি কুমড়া দিয়ে চিংড়ি মাছ। দুই'শ বছরেরও বেশি সময় ধরে পাশাপাশি বাড়িতে থেকেও বাঙালি মুসলিম এবং হিন্দু বাড়ির রান্নাগুলো সম্পূর্ণ আলাদা।

আলাদা ওদের খাওয়ার ধরণও। হিন্দু বাড়িতে এঁটো-কাঁটার ছোঁওয়া বড় বেশি। আজকাল সবাই টেবিলে বসে একসাথে খাওয়ার চল হয়েছে। কিন্তু বেশির ভাগ হিন্দু বাড়িতেই আগে খাবার বেড়ে দিত পরিবেশনকারী – মা, ঠাকুমা কিংবা দিদা। সকলের পরে খেত ওঁরা। খুবই সতর্ক থাকত সবাই যেন খেতে বসে কোনকিছুতে বাম হাতের ছোঁওয়া না লাগে। এঁটো ডানহাত দিয়ে ওরা কখনো কোন হাতা বা তরকারির বাসনও ছুঁয়ে দিত না। এখনো মনে আছে ছেলেবেলায় আমি গ্রামের বাড়িতে বাম হাত দিয়ে তরকারির বাসন ছুঁয়ে দিয়েছিয়াম আর ওরা বাসন ধরে সব তরকারি ফেলে দিয়েছিল।

মুসলিম বাড়িতে এসব উপদ্রব নেই । খেতে বসে এঁটো ডান হাত দিয়ে তরকারির বাসন বা হাতা ধরলে কিছুই যায় আসে না ওঁদের । আসলেই তো কী বা যায় আসে ?

যদি মাটিতে মাদুরে বসে খাওয়া হয় তবে চিরকাল দেখেছি হিন্দুরা এঁটোকাঁটা বাঁচিয়ে থালা বাটি সব মাটিতে রাখবে, মরে গেলেও মাদুরের উপর নয়। মুসলিমরা সেখানে মাদুরের উপরেই থালা রাখে – ওদের ছুৎ মার্গ নেই । ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় শুনেছি অনেক হিন্দু মুসলিম নাম নিয়ে যখন গ্রামে পালিয়ে গিয়েছিল, গ্রামের লোক ওরা যে হিন্দু তা বুঝে ফেলেছিল ওদের মাদুরের উপর থালা না রেখে খাওয়া দেখেই।

যাহোক এসব নিয়ে বেশি কথা বললে রায়ট লেগে যেতে পারে। ভিতরে ভিতরে এতটাই অসহিষ্ণু আমরা! হিন্দু মুসলিম আজও খাওয়া দাওয়ার চরম স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে পাশাপাশি থাকে। যে যার খাওয়া দাওয়ার বৈচিত্র্য নিয়ে, কেউ রান্নায় অনেকটা পিঁয়াজ-রসুন দিয়ে আর কেউ একেবারেই না দিয়ে।

আর তাই ২০১৬ সালে যখন বাংলাদেশে গেলাম আর আমার ছোটমাসী মণিমা বলল, 'কি রে ছিটারুটি খাবি ? শাহানা খুব ভালো বানায়', আমি তো আপ্লুত হ'য়ে গেলাম। ছিটারুটি মনে হ'য় পুরোপুরিই মুসলিম গ্রামের রান্না ।

আগে আমাদের বাড়ি দিনের বেলা কাজের জন্য মুসলিম মেয়েরা থেকেছে। কিন্তু রাতদিনের জন্য থেকেছে ললিতা, সরস্বতী কিংবা লক্ষ্মী। শাহানাই কি প্রথম যে রাতদিন থাকছে ? মণিমার চাকরির জন্যই বাড়িতে কাজ করবার মানুষের জন্য আলাদা ঘর আছে, সে ঘরে টিভি আছে, ঘরের সামনে বারান্দা আছে, বাথরুম আছে, সত্যিকারের বিছানা আছে। সবসময় দেখেছি বাড়িতে যারা কাজ করে তারা দিনের শেষে মাটিতে বিছানা ক'রে মশারি টাঙ্গিয়ে ঘুমায়, রান্নাঘরে আলাদা বসে চুপচাপ খায়।

শাহানা খুব অল্প বয়সে বিয়ে ক'রে। তিন ছেলেমেয়ে হ'য়। তাদের রেখে স্বামী মারা যায়। তারপর শাহানা পছন্দ ক'রে আবার বিয়ে ক'রে। একবার কেউ আমাকে বলেছিলো খুব নিম্নবিত্ত আর উচ্চবিত্তদের মাঝে অনেকগুলো বিয়ে দেখা যায়। ওরা বেশ নিজেদের পছন্দমত চলতে পারে। মধ্যবিত্তরাই শুধু ধুঁকে ধুঁকে মরে। ওদের লেপ তোষক, ওদের লোকলজ্জা, ওদের সবাই কী বলবে নিয়ে। আমি মনে ক'রি কথাটা সত্য। কিন্তু সমাজ টিকিয়ে রাখবার দায়িত্ব কেউ আসলে মধ্যবিত্তকে দেয় নি। দেয়নি একটু একটু ক'রে শেষ হ'য়ে যাওয়ার পথটুকু।

আমি সবসময়ই যে কথা বলতে চাই তা বাদ দিয়ে অন্য অনেক কিছু নিয়ে বলে ফেলি – সমাজ সংস্কার, এঁটো কাঁটা, জীবনের আবর্জনা। বকরি ঈদের বিরিয়ানি কিংবা পূজার লাবড়া খাওয়ার সময়ও ।

শাহানা ছিটারুটি বানালো। এমন কিছু আমি কোনদিন খাই নি । চালের গুঁড়া দিয়ে কড়াই-এ আঙুল দিয়ে ছিটিয়ে ছিটিয়ে তৈরি করল ও রুটি । মণিমা বলল ছিটারুটি খেতে হ'য় পিঁয়াজ, কাঁচা মরিচ, সরষের তেল দিয়ে ডলে; কিংবা খুব কষানো খাসির মাংস দিয়ে। আমি অমৃত খেলাম !

কল্যাণী রমা – জন্ম ঢাকায়। ছেলেবেলা কেটেছে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে। ভারতের খড়গপুর আই আই টি থেকে ইলেকট্রনিক্স এ্যান্ড ইলেকট্রিক্যাল কমুনিকেশন ইঞ্জিনীয়ারিং-এ বি টেক করেছেন । এখন আমেরিকার উইস্কনসিনে থাকেন। অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্ট সিনিয়র ইঞ্জিনীয়ার হিসাবে কাজ করছেন ম্যাডিসনে। ২০১৫ সালে 'যুক্ত' থেকে প্রকাশিত হয়েছে কল্যাণী রমার প্রথম বই 'আমার ঘরোয়া গল্প'। ২০১৬ সালে 'চৈতন্য' থেকে প্রকাশিত হয়েছে দু'টো অনুবাদের বই। ইয়াসুনারি কাওয়াবাতার 'হাতের পাতায় গল্পগুলো' আর সিলভিয়া প্লাথ, অ্যান সেক্সটন, মেরি অলিভারের কবিতা নিয়ে 'রাত, বৃষ্টি, বুনোহাঁস'। ২০১৭ সালে 'যুক্ত' থেকে প্রকাশিত হয়েছে কল্যানী রমা'র কাব্যগ্রন্থ 'জলরঙ', হেনরিক ইবসেন-এর নাটকের অনুবাদ 'মরণ হ'তে জাগি' ও স্মৃতিকথা 'দমবন্ধ'। ২০১৮ তে প্রকাশিত হয়েছে মৌলিক রচনা 'রেশমগুটি'।

রঞ্জিতা চট্টোপাধ্যায়

রূপতাপস রামকিঙ্কর – ব্যক্তিগত শ্রদ্ধার্ঘ্য

"মুহূর্তকে অনন্তে বদলাতে
শিলার গায়ে থমকে আছে ছেনি, . . ."

শান্তিনিকেতন চত্বর জুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ভাস্কর্যগুলো দেখলে এমনটাই মনে হয়। সময় থমকে আছে এদের মধ্যে। সাঁওতাল পরিবার, গতি, সুজাতা বা রবীন্দ্রনাথের আবক্ষ মূর্তি – খোলা আকাশের নীচে, সূর্যের আলোয়-গাছপালার সঙ্গে মিলেমিশে দাঁড়িয়ে আছে। রোদে পুড়ছে, জলে ভিজছে, গায়ে মাখছে ছয় ঋতুর জলহাওয়া। শান্তিনিকেতনের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে ওতপ্রোতভাবে। কবিগুরু আর শান্তিনিকেতন যেমন আলাদা করা যায় না, ঠিক তেমনই আলাদা করা যায় না শান্তিনিকেতনের পরিবেশ আর এইসব ভাস্কর্য। কে এই মহান শিল্পী ? এর উত্তর আজ প্রায় সকলেরই জানা। শিল্পী রামকিঙ্কর বেইজ আধুনিক ভারতের শ্রেষ্ঠ ভাস্কর এবং অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিত্রী। শুধু আধুনিক ভারতেরই বা কেন, রামকিঙ্কর সারা পৃথিবীর প্রথম সারির আধুনিক ভাস্করদের মধ্যে একজন।

"ভাস্কর, তার স্থবিরতাই প্রিয়।
রইল খোদাই ফুলকিতে জোনাকি। . . .
আমরা এখন প্রাতঃস্মরণীয়।
রামকিঙ্কর শিল্পী ছিলেন নাকি ?"

নিজের সমকালে কিংবদন্তী এই শিল্পীর যথাযথ মূল্যায়ন হয়েছিল কিনা তা বিতর্কের বিষয়। সোমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা "শিল্পী রামকিঙ্কর আলাপচারি" বইতে তাঁর জীবনের শেষের দিনগুলোর একটা চিত্র পাই। শিল্পী শুয়ে আছেন চুপচাপ। চোখের কোলে গভীর কালি। ঘর অন্ধকার। কলাভবনের নতুন প্রজন্মের ছাত্রছাত্রীরা কেউ কেউ আসছে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। লেখক বলছেন,এরা কোনদিন জানবে না, "এ মানুষটির সঙ্গ কী আশ্চর্য বস্তু। শুধু শিল্পী নন, শিক্ষকও নন শুধু, সহমর্মী বন্ধুও নন – একটি জীবন্ত পরিমণ্ডল – যার মধ্যে একটুখানি থাকাই এক দুর্লভ অভিজ্ঞতা, বহু ভাগ্যে যা মেলে।" শুধু নতুন প্রজন্ম নয় – তাঁর সমসাময়িক মানুষরাও বুঝেছিলেন কি শিল্পী হিসেবে রামকিঙ্করের অসামান্যতা ?

আমি কোন শিল্পবোদ্ধা নই। শিল্প সমালোচকও নই। আমার আছে শুধুই মুগ্ধতা। শ্রীনিকেতন থেকে সংগীতভবন যাওয়ার পথের মোড়ে দাঁড়িয়ে আছি একটি মূর্তির সামনে। এটির নাম দেওয়া হয়েছে 'শ্রম'। কেউ কেউ বলে 'ধানঝাড়া'। দু পা ফাঁক করে দাঁড়ানো একটি দেহ। দু হাত তোলা। পিছনে হেলানো ঘাড় ও মাথা। খড়ের আঁটি শক্ত করে ধরা হাতে। ঠিক যেন পাটাতনে ধানের গোছা আছড়াবার আগের মুহূর্ত। কংক্রিট এ জমাট বাঁধা মূর্তি থেকেও ফুটে বেরোচ্ছে গতি আর প্রাণশক্তি। যেন জীবন্ত ! মূর্তির মাথাটি শুধু নেই। কেন? বিশুদ্ধ কায়িক শ্রমের মূর্তি কি এটি ? মাথার ব্যবহারের কোন প্রয়োজন নেই এই শ্রমিকের ? রামকিঙ্করের ভাস্কর্যের জগতে আমার বিস্ময়ভরা ভ্রমণের সেই শুরু। যত দেখি মুগ্ধতা ততোই বেড়ে চলে। কলাভবনের বাগানে রাস্তার ধারে আর এক মূর্তি, 'কলের বাঁশি' – দুই সাঁওতাল যুবতী। যেন সত্যি কলের বাঁশি শুনে আঁচল উড়িয়ে দ্রুত পায়ে চলেছে। মাটিতে তাদের পা পড়ে না। পেছনে পেছনে একটি বাচ্চা ছেলে দৌড়োচ্ছে। হাতে বাঁশি। হাওয়ায় খেলা করছে যুবতীদের কংক্রিটের শাড়ীর আঁচল। সিমেন্ট আর কাঁকর মিশিয়ে মূর্তি বানানোর একধরণের উপাদান তৈরী করেছিলেন তিনি। এ কাজটি তাই দিয়ে করা। সাঁওতাল মেয়েদের চলমানতা, তাদের হাতের ফুলে ওঠা পেশীর সূক্ষ্ম অথচ স্পষ্ট স্পন্দন স্থির হয়ে আছে মূর্তিতে। স্থির কিন্তু স্থবির নয়। ভারী অবাক লাগে।

জানতে ইচ্ছে করে মহান এই শিল্পীর শিল্পভাবনা ও তাঁর পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে। কেমন ছিল তাঁর কাজের জগৎ ? কি ছিল তাঁর অনুপ্রেরণা ? কি ধরনের প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হতে হয়েছিল তাঁকে ? এই ইচ্ছে থেকেই শিল্পীর জীবন ও কাজ সম্বন্ধে সামান্য পড়াশোনা। আমার মতে তাঁর মতো বিশাল মাপের এক পরিমণ্ডলকে কিছু শব্দের মাধ্যমে প্রকাশ করতে চাওয়াও এক ধরণের ধৃষ্টতা। তাই পাঠকদের কাছে মার্জনা চেয়ে এগোচ্ছি। এ লেখাটি শিল্পী রামকিঙ্কর বেইজের উদ্দেশ্যে নিতান্তই ব্যক্তিগত শ্রদ্ধার্ঘ্য। বিশেষ কোন তথ্য পরিবেশন লেখাটির মুখ্য উদ্দেশ্য নয়।

শ্রম

রামকিঙ্করের শিল্পভাবনা ছিল একেবারেই তাঁর নিজস্ব। বারে বারে তা ফুটে উঠেছে তাঁর শৈলীতে। প্রথা ভেঙে সৃষ্টি করেছিলেন তিনি। বাগানবাড়ীতে ফোয়ারার পাশ বা চৌরাস্তার মোড় নয়, তাঁর স্থাপত্য সৃষ্টির জন্য তিনি বেছে নিয়েছিলেন খোলা মাঠ। সেখানে রোদে, জলে, জ্যোৎস্নায় নিয়মিত স্নান করে তাঁর সুজাতা, কবিগুরুর আবক্ষ মূর্তি বা মিথুন। প্রকৃতির সঙ্গে মিলেমিশে দাঁড়িয়ে থাকে তারা। তাঁর শিল্পকীর্তির ছন্দ আর আশপাশের সহজ জীবনের ছন্দ মিলেমিশে যায়। Museum-এর কৃত্রিম আলোয় কাচের ঘেরাটোপের মধ্যে থেকে দেখা ভাস্কর্যের সঙ্গে এর অনেক তফাৎ। তিনি বলতেন, "আমার বাপু রেলিঙে ঘেরা মূর্তি ভালো লাগে না। বড্ডো বেশি দেখো দেখো ভাব। জমির সঙ্গে আশপাশের সঙ্গে জীবনের সঙ্গে মিলেমিশে থাকা মূর্তিই ভালোবাসি আমি।" তাঁর মতে রেলিঙে ঘেরা মূর্তি যেন স্টেজের গান। আর তাঁর পছন্দ হলো আসর। তিনি স্থির মডেল নিয়ে কখনো কাজ করেন নি। নিজের চোখের সামনে ঘুরে বেড়ান মানুষজন, – তাদের চলা, বলা, হাসি – এসবই মূলতঃ ফুটে উঠেছে তাঁর ভাস্কর্যে। পাথর বা ব্রোঞ্জ তাঁর সাধ্যের মধ্যে ছিল না। তাই মূর্তি গড়ার মাধ্যম হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন নানাধরণের বিকল্প যেমন সিমেন্ট, কংক্রিট, কাঁকর, ল্যাটেরাইট চুর্ণ প্রভৃতি। লোহার রড বা খড় দিয়ে কাঠামো তৈরী করে শান্তিনিকেতনের আশেপাশে সহজপ্রাপ্য খোয়াইয়ের কাঁকর ও সিমেন্টের মিশ্রণ ছুঁড়ে ছুঁড়ে লাগিয়ে বের করে এনেছিলেন এইসব ভাস্কর্যগুলির অবয়ব। উপাদান নির্বাচন ও ব্যবহারের এই পদ্ধতি ছিল তাঁর মৌলিক আবিষ্কার। সৃষ্টির এই অভিনব পদ্ধতিতে তাঁর ভাস্কর্যগুলিতে ফুটে উঠেছে এমন সব টেক্সচার যা গাছের গুঁড়ি বা শাখাপ্রশাখার উপরিভাগের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। একটু কর্কশ আর বুনো ভাব যেন মূর্তিগুলিতে ! প্রকৃতি আর শিল্পসৃষ্টি মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। মজার কথা হল এ নিয়ে নির্দিষ্ট কোন তত্ত্ব ছিল না তাঁর। বিশেষ কোন আঙ্গিকেরও ধার ধরতেন না তিনি। এ বিষয়ে তাঁকে প্রশ্ন করা হলে বলেছেন, "যা দেখেছি তাকেই দেখাতে গিয়ে কিছু নতুন নতুন পদ্ধতি, পরীক্ষা এ সব এসে গেছে কাজে। কি করে যে কি হয় ঠিক বলা যায় না। চলতে চলতে নানা জিনিস কুড়িয়ে পাই। অনেক সময় যা ভাবি নি তাই হয়। ভেবে যেমন হয়, না ভেবেও তেমনি। হঠাৎ এসে গেলো – খেলে গেলো মাথায়। বলা মুশকিল, বলা যায় না জোর করে কিছু।" "Artists have no time for theory" – তাঁর শিল্পভাবনার এটি ছিল মূলের কথা। তাইজন্যই তাঁর রচনা গুলি দেখতে দেখতে মনে হয় এমনটা তো আর কোথাও দেখি নি। স্থির মূর্তির এমন আদিম রুক্ষতায়, এই বিশালতা, আবেগ আর গতিময়তায় বিহ্বল হয়ে পড়ে মন।

প্রথাগত শিল্পশিক্ষা বলতে যা বোঝায় তা তাঁর ছিল না। তবে শিখেছেন নানাভাবে। নানাজনের কাছে। কাঠের কারিগর অনন্ত মিস্ত্রী ছিলেন তাঁদের প্রতিবেশী। দেবদেবীর পট আঁকতেন তিনি। গড়তেন মাটির প্রতিমা। রামকিঙ্করের শিল্পশিক্ষার প্রথম পাঠ তাঁরই কাছে। ঘুরেছেন বহু। রাজগীর গেছেন একাধিক বার। দেখেছেন উত্তর ভারতের সব কাজ। অজন্তা – ইলোরা, কোনারক, ভুবনেশ্বর – এসবও বাদ যায় নি। দেখেছেন এক শিল্পীর মন নিয়ে। এই দেখতে দেখতে, চলতে

চলতেই তাঁর শেখা। ভারতীয় ভাস্কর্যে পাথরের ভূমিকাকে গভীর মনোযোগের সঙ্গে বিচার বিবেচনা করেছিলেন তিনি। বিশ্বাস করতেন দেখে শেখায় আবার কখনো কখনো ঠেকে শেখায়ও। হাতে নাতে কাজ করে শিখেছেন তিনি। বিষ্ণুপুরে টেরাকোটার কাজ নকল করে যেমন অনেক শিখেছেন, অনেক জেনেছেন তেমন অনন্ত মিস্ত্রীর দুর্গাপ্রতিমার গণেশ গড়তে গিয়েও আবিষ্কার করেছেন নতুন একটা ছন্দ। রবিবর্মার ছবিও শিখিয়েছে তাঁকে। শিখেছেন শান্তিনিকেতনে এসেও। তবে সেটা ঠিক শিক্ষকের কাছে শেখা নয়। তাঁর কাছে দেখতে জানা আর শেখা ছিল সমার্থক। সার্থক শিল্পী হলো জীবনরসিক। চারপাশের জীবনে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে তার শিল্পের বিষয়বস্তু। তাঁর মতে "আর্টিস্ট মাত্রই হলো ভুঁইফোঁড়।" স্বশিক্ষিত শব্দটি তেমন পছন্দ ছিল না তাঁর। শিল্পী হল ভুঁইফোঁড় – মাটি ফুঁড়ে যে ওঠে। আর মাটি তাঁর কাছে ছিল জীবনের আর এক নাম। শৈশব থেকে নানাভাবে জীবনকে দেখেছেন তিনি। বুঝেছেন নানাভাবে। যা দেখেছেন, যা বুঝেছেন তাকেই ধরতে চেয়েছেন ভাস্কর্যে বা ছবিতে। জলজ্যান্ত সব আইডিয়া কে জড় পদার্থের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলার জন্য যখন যেমন মনে হয়েছে তেমন পদ্ধতি ব্যবহার করেছেন। সম্পূর্ণ নিজস্ব ভঙ্গীতে। তাঁর নিজের কথায় "টেকনিক বলে আসলে আলাদা কোনো জিনিস নেই। শিল্পীর ভাবনা আঁকুবাঁকু করতে থাকে বেরোবার জন্য। নিজেই পথ করে নেয়। বেরোবার পথটাকেই বাইরে থেকে লোকে বলে টেকনিক। "রামকিঙ্কর ছিলেন জাত ভাস্কর। চারপাশের প্রকৃতি, মানুষ আর পশুপাখীর মধ্যে খোঁজ পেয়েছিলেন শিল্পসৃষ্টির মালমশলার। তারপর মনের আগুনে পুড়িয়ে রূপে আর রেখায় গড়তেন তাদের। এ আগুন একেবারেই তাঁর ভিতরের জিনিস।

"পাথর যখন পাথুরে হাত ধরে,
হাওয়ায় তোমার উস্কোখুস্কো চুল ....."

মানুষ রামকিঙ্কর কেমন ছিলেন ? তাঁর শিল্পসৃষ্টির মতোই তাঁর ব্যক্তিত্ব, জীবনযাত্রা ও জীবনভাবনা ছিল অভিনব। মজবুত চেহারা আর উপচে পড়া প্রাণশক্তি নিয়ে কাজ করে চলতেন প্রাণপণ। জোরালো মুখাবয়বে ছিল আদিবাসী ছাপ। তা নিয়ে নিজেই ঠাট্টা করে বলতেন, "আমি বাবা এই রাঢ়ের মাটির মানুষ, তাই এখানকার মাটি আর মানুষজনকে নিয়ে ছবি আঁকি, মূর্তি গড়ি।" সহজ সরল জীবনযাত্রা প্রণালী। চারদিকের পৃথিবী দেখতেন প্রাণভরে। ভালবাসতেন। আর পরম আনন্দে সেই ভালবাসার প্রকাশ ঘটিয়ে চলতেন নানা শিল্প মাধ্যমে। কঠিন কর্মে ছিল তাঁর অফুরন্ত আনন্দ। শান্তিনিকেতনে ছড়িয়ে থাকা বড় বড় মূর্তি সবই গ্রীষ্মকালে করা। নিদারুণ গ্রীষ্মে রাঢ়ের সূর্যও সে অঞ্চলের মাটির মতো হয়ে উঠতো রক্তরাঙা। চারপাশের সজীবতা সে শুষে নিত লহমায়। শান্তিনিকেতনের সেই রুক্ষ প্রকৃতি রামকিঙ্করকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করত। নিষ্করুণ গ্রীষ্মের দুপুরে মাঠে, ঘটে শালবনে ঘুরে বেড়ান তাঁর একটা নেশা ছিল। ঠাঠা রোদের মধ্যে খোলা আকাশের নীচে একের পর এক কাজ করে চলতেন। সোমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আলাপচারিতার সময় তিনি বলেছেন, "আমার মূর্তিগুলো আসলে এসেছে বেশিরভাগ হাট মাঠ ঘাট থেকে। আমি কাজ ভালোবাসি। কাজ যারা করে তাদের ভালো লাগে। ভালোবাসি তাদের। সাঁওতাল এসেছে আমার ছবিতে মূর্তিতে বেশী ওই কারণেই। ওরা যে আমাকে টানে তার কারণ ওদের জীবন – জীবনের শক্তি আর ছন্দ।" রামকিঙ্কর মানেই ছিলেন একরাশ প্রাণশক্তি আর উদ্যম। কারণে অকারণে হেসে উঠতেন হাহা করে। সেই হাসিতে ভেসে যেত মান অপমান, বঞ্চনা, জ্বালা, হতাশা, ক্ষোভ। গলায় ছিল রবীন্দ্রনাথের গান। গাইতেন উঁচুস্বরে, কিছুটা নিজস্ব আবেগ মিশিয়ে। ছবি আঁকা আর মূর্তি গড়ার পাশাপাশি চলত সেসব গান। কখনো কখনো গান গাওয়ার আবেগ শিল্পসৃষ্টির আবেগকে ছাপিয়ে যেত। তখন ছাত্রছাত্রীদের ডেকে নিয়ে কলাভবনের বাগানে জমিয়ে দিতেন নাচগানের মজলিশ। বাউল নাচের ভূমিকাটি সর্বদাই ছিল তাঁর নিজের। ভালোবাসতেন নাটক। শুধু কি ভালোবাসতেন নাকি ? তিনি ছিলেন নাটক পাগল। নাটক ছিল তাঁর আর এক নেশা। বাঁকুড়ায় থাকতে থিয়েটারের সিন্ আঁকতেন। তারপর শান্তিনিকেতনে এসে রবীন্দ্রনাথের পরিচালনায় অভিনয় করেছেন নাটকে। নিজে নাটক পরিচালনাও করেছেন। নাটকের মঞ্চসজ্জা আর অঙ্গসজ্জার কাজে হয়তো তাঁর অসাধারণ শিল্পীমন একটা অন্যরকম প্রকাশের সন্ধান পেয়েছিলো। তাই উৎসাহের সঙ্গে করতেন এসব কাজ।

"বৃষ্টি এলে মরা নদীর চরে
দেহ তোমার ডাকে নি মাস্তুল।"

জীবনের প্রথমদিকে কলাভবনের অধ্যাপক হিসেবে তাঁর বেতন ছিল সামান্য। রবীন্দ্র-যুগের অন্যান্য অধ্যাপকদের মতো। একসময় বিশ্ববিদ্যালয়টি ভারত সরকারের আওতায় এল। তৈরী হল লেকচারার, রিডার, প্রফেসর ইত্যাদি পদবিন্যাস। তখন দেশজোড়া খ্যাতি নিয়েও রামকিঙ্কর থেকে গেলেন এসিস্ট্যান্ট লেকচারার পদে। এর মূলে হয়তো ছিল অর্থ, খ্যাতি ও পদমর্যাদার প্রতি তাঁর সম্পূর্ণ নিরাসক্তি। পরবর্তী জীবনে প্রফেসর হয়েছিলেন তিনি। বেড়েছিল আয়। ছবি বা মূর্তি বিক্রী করেও অর্থ উপার্জন করেছিলেন সেই সময়ে। তাঁর ছাত্র প্রভাস সেনের বর্ণনায় পাই যে রোজগার বাড়া সত্ত্বেও তাঁর জীবনযাত্রা প্রণালী আগাগোড়া প্রায় একই রকম ছিল। "দু প্রস্থের বেশী জামাকাপড় বা এক জোড়ার বেশী জুতো তাঁর কখনো ছিল না। মাসের শেষে পারিশ্রমিক পেয়ে বালিশের নীচে রেখে দিতেন। তারপর ভুলে যেতেন। পনেরো-ষোলোশো টাকা এনেও মাসের শেষ দিকে রুটি আর বেগুন পড়া খেয়ে, ছেঁড়া জামা গায়ে ঘুরে বেড়াতেন। জিজ্ঞাসা করলে বলতেন, 'সত্যি তো, কোথায় যায় বলো দেখি টাকাগুলো ? এত তো খরচ হবার কথা নয় ? তবে বুঝলে বেগুন পোড়া দিয়ে রুটি বেশ লাগে কিন্তু।' বলেই হা হা করে হাসি। "নন্দলাল বসুর শ্রাদ্ধের সময় শিল্পীর সঙ্গে দেখা করতে গেছেন তাঁর আর এক ছাত্র শঙ্খ চৌধুরী। তাঁর এক ছাত্রের দেওয়া মাটির ঘরে তিনি থাকেন তখন। চারদিকে গরু, বাছুর, ঘরবাড়ি। অভাবের ছাপ পরিবেশে। বাড়ির চাল ভাঙা। 'কেমন অছেন' – শঙ্খ বাবুর এ প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, "ওসব কথা ছেড়ে দাও। মোড়াটা নিয়ে বসো। একটা গান গাও দিকি।" নিজের জীবন আর সৃষ্টিকে নির্মোহ দৃষ্টিতে দেখতে পেরেছিলেন বলেই বোধহয় এভাবে পথ চলা তাঁর সম্ভব হয়েছিল। প্রায় চার দশক ধরে নানা শিল্পসাধনায় ডুবে থাকলেও তিনি নিজে থেকে কখনো কোন প্রদর্শনী করার আগ্রহ দেখান নি। তাঁর কাজগুলো দেখতে দেখতে আমার মতো শিল্প সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ মানুষের কাছেও একটা বিষয় সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। তা হলো একটি বলিষ্ঠ সৃষ্টিশীল মানুষের প্রকৃতির প্রতি, জীবনের প্রতি অগাধ ভালবাসা। সৃষ্টির আনন্দে বিভোর এক শিল্পী জীবনের সুখ দুঃখের অপূর্ব প্রকাশ ঘটিয়ে চলেছেন। তাঁর সম্বন্ধে নানা লেখা পড়ে জানতে পারি যে এই আনন্দটুকু ছাড়া নিজের সৃষ্টি থেকে আর কিছু পাওয়ার আশা তাঁর মনে স্থান পায় নি।

শুধুমাত্র ভাস্কর্যকলাই নয়, ভারতীয় আধুনিক চিত্রকলার ক্ষেত্রেও অশেষ গুরুত্বপূর্ণ তাঁর দান। রামকিঙ্করের ছবির সঙ্গে আমার পরিচয় অনেক দূর থেকে। পুরোনো শারদীয়া 'দেশ' বা 'আনন্দবাজার' পত্রিকায় তাঁর আঁকা ছবির প্রিন্ট দেখেছি। সে সব ছবির গুণগত মান বোঝার ক্ষমতা আমার নেই। শুধু তাকিয়ে থাকি সে সব ছবির দিকে। নীল রঙের কাজল ছবি জুড়ে। নানা ছবিতে – বার বার। নীল মাটি। এ প্রসঙ্গে সোমেন্দ্রনাথকে তিনি বলছেন, "একদিন মাটি দেখলাম হঠাৎই। বর্ষার জলের তোড়ে উপরের লাল বালি কাঁকর সব ক্ষয়ে ধুয়ে গেছে। বুঝলে ? বেরিয়ে পড়েছে আশ্চর্য নরম নীল মাটি। দুহাত দিয়ে তুলে নিলাম, ধরলাম দু চোখের সামনে। কি নরম মাখনের মতো – কি অদ্ভুত নীল। শুধু মূর্তি নয়, আমার ছবিতেও ওই মাটি। আমার ছবিতে নীল রং দেখো নি ? সে তো ওই মাটির রং।" বাঁকুড়ার গন্ধেশ্বরী নদীর পারে নীলমাটির দেশ থেকে চলে এসেছিলেন বীরভূমের লাল মাটির দেশে। রামকিঙ্কর তখন সবে কৈশোর পার হচ্ছেন। বাঁকুড়ার 'অরোরা ড্রামাটিক ক্লাব' এর নাটকের দৃশ্য এঁকে চলেছেন তেলরঙে। দেশ জুড়ে অসহযোগ আন্দোলনের জোয়ার। দেশের নেতাদের পোর্ট্রেট করছিলেন তিনি তেলরঙে। সেই সময় কলকাতা থেকে তার বাঁকুড়ার বাড়ীতে এলেন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। তাঁর কাজ দেখে খুশী হয়ে ডেকে পাঠিয়েছিলেন তাঁকে। বলেছিলেন শান্তিনিকেতনে গিয়ে কাজ শিখতে। একদিন রামানান্দবাবুর কাছ থেকে একখানা পোস্টকার্ড এল – সে চিঠিতে বোলপুর যাওয়ার নিমন্ত্রণ ও পথনির্দেশ ছিল। সেদিন হঠাৎই জীবনের মোড় ঘুরে গেলো তাঁর। জন্মস্থান বাঁকুড়ার যুগীপাড়া, ছেলেবেলার অনুপ্রেরণা অনন্ত মিস্ত্রী, নিজের মা, বাবা, দাদা, বৌদি সব পড়ে রইল পিছনে। একটা টিনের তোরঙ্গে হাতের কিছু কাজ – পেন্সিল স্কেচ, অয়েল ল্যান্ডস্ক্যাপ, পোর্ট্রেট, জলরঙের কাজ এইসব নিয়ে উনিশ বছরের রামকিঙ্কর বেইজ যোগ দেন শান্তিনিকেতনের কলাভবনে। সেটা ছিল ১৯২৫ সাল। এলেন নতুন দেশে – সম্পূর্ণ অন্য এক জগতে। কলাভবনে তখন শুধু ছবির চর্চাই

হতো। মূর্তি তৈরীর ঐতিহ্য সেখানে তৈরী হয় নি তখনো। কিন্তু বিশ্বশিল্পের আলোয় আলোকিত কলাভবনের সৃজনশীল পরিবেশ নিঃসন্দেহেই রামকিঙ্করের প্রতিভার বিকাশে সাহায্য করেছিল। তিরিশের মাঝামাঝি সময়ে তিনি তৈরী করেন 'সুজাতা'-এক বিস্ময়কর সৃষ্টি। শান্তিনিকেতনের খোলা মাঠে করা এই ভাস্কর্যটির মধ্যে দিয়েই সৃষ্টিশীল, পরিবেশীয় ভাস্কর্যের সূচনা হল ভারতে।

কে কাকে ধন্য করল ? শান্তিনিকেতনে এসে রামকিঙ্কর ধন্য হলেন? নাকি শিল্পীকে পেয়ে ধন্য হলো শান্তিনিকেতনের শিল্পচর্চার আবহ ? দুই ই সত্যি। গল্পসল্পের কুসমি বলেছিল যে তার দাদামশায় তাঁর চারদিকে যত পাগলের দল জমিয়েছিলেন। যে শান্তিনিকেতনে রামকিঙ্কর এসে উপস্থিত হলেন সেখানে এমন একটা জগৎ ছিল যেখানে প্রথা ভাঙা লোকজন খুব সহজে জায়গা পেতেন। ছকে বাঁধা চরিত্রদের সঙ্গে তাঁদের মেলান কঠিন। এইসব 'নন-কন্ফর্মিস্ট' মানুষজন নিজেদের নিজস্বতা বজায় রেখেও আশ্রমের ঐকতানের মধ্যে বেসুর বাজতে দিতেন না। বরং আশ্রমের সামগ্রিক পরিবেশকে আরও সমৃদ্ধ করে তুলতেন তাঁরা। মাস্টারমশাই নন্দলাল, দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ক্ষিতিমোহন সেনশাস্ত্রীর মতো মানুষেরা এমন সব অসাধারণ ব্যাক্তিত্বকে গ্রহণ করার উপযুক্ত উদার ও সংশ্লেষী আবহাওয়া তৈরী করেছিলেন শান্তিনিকেতনে। সে যুগের শান্তিনিকেতনের সৃষ্টিশীল বাতাবরণ ও পৃথিবীর নানা প্রান্তের জ্ঞানীগুণীদের সমাবেশ অবশ্যই সমৃদ্ধ করেছিল রামকিঙ্করের মননশীলতা। বলাই বাহুল্য যাঁদের নিরলস প্রচেষ্টায় শান্তিনিকেতনে তাঁর মতো শিল্পীদের নতুন ধরণের কাজের সুযোগ হয়েছিল গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ নিজে ছিলেন তাঁদের পুরোভাগে। রবীন্দ্রনাথের দুখানি পোর্ট্রেট করেছিলেন রামকিঙ্কর। অল্পবয়সে শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন তিনি। কলাভবনে একান্তে কাজ করেছেন। আশ্রম গুরুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে নি কখনো। কিন্তু তাঁর শিল্পীর চোখ আর অনুভব দিয়ে পোর্ট্রেট আঁকতে গিয়েই বুঝে নিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ নাবী ওই বিশাল ব্যক্তিত্বকে। তাঁর কথাতে সে প্রমাণ পাই, "টেবিলে ঝুঁকে পড়ে লিখছেন কবিগুরু। বাজারের মিষ্টি মোলায়েম কবিগুরু নয়। এই রবীন্দ্রনাথকে খুব কম লোকই চিনেছে। সারাটা জীবন লোকটা কি বলে গেল, করে গেলো নিজের হাতে-শিলাইদায়, এখানে শান্তিনিকেতনে, বুড়ো বয়স পর্যন্ত ভিক্ষে করে – কে দেখে মন দিয়ে বলো দেখি। সারা জীবন এমন হাড়ভাঙ্গা খাটুনিই বা কজন খেটেছে আমাদের দেশে ?" এই কর্মনিষ্ঠ সাধনা দৃষ্টান্তের কাজ করেছিল তরুণ শিল্পীর জীবনে। রামকিঙ্করের পোর্ট্রেট আঁকাকালীন একটি দিনে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে বলেছিলেন বাঘের মতো কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তে। শেষ করে আর ফিরে না তাকাতে বলেছিলেন। বলেছিলেন ছেড়ে দিয়ে অন্য কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তে। আর সেটাই মন্ত্র হয়ে উঠেছিল রামকিঙ্করের শিল্পী জীবনে। সে মন্ত্র তিনি কখনো ভোলেন নি। বরং আঁকড়ে ধরে থেকেছেন তাকে। এক একটা ফর্ম এ চূড়ান্ত সিদ্ধিকে ঠেলে ফেলে দিয়ে ছুটে গেছেন নূতনের সন্ধানে।

"দিন কেটেছে সামান্য নুনভাতে
আমরা ছিলাম পিছিয়ে পড়া শ্রেণী"

কিংবদন্তী এই ভাস্করের জন্ম হয় এক দারিদ্র্যতাড়িত ক্ষৌরজীবী পরিবারে। সে পরিবারের প্রত্যেকটি সদস্যের দিন কাটে দৈনন্দিন ক্ষুন্নিবৃত্তির সংগ্রামে। শিল্পকলাচর্চার মতো পরিবেশ বা পরিস্থিতি কোনটাই ছিল না তাঁর বাল্য ও কৈশোরের দিনগুলিতে। কিন্তু তা সত্ত্বেও কেমন করে যেন শিল্পকলার প্রতি এক অমোঘ টান অনুভব করতেন চন্ডীচরণ পরামানিক আর সম্পূর্ণা দেবীর পঞ্চম সন্তান শ্রী রামকিঙ্কর বেইজ। (বেইজ পদবীটি জীবনের পরবর্তীকালের।) এই টানেই পারিবারিক-সামাজিক-অর্থনৈতিক বাধাবিপত্তি অগ্রাহ্য করে সামনের দিকে এগিয়ে চলেছিলেন তিনি। প্রত্যক্ষদর্শী বিশ্বজিৎ রায়ের বর্ণনায় সৃষ্টিমগ্ন রামকিঙ্কর জীবন্ত হয়ে ওঠেন। বীরভূমের গ্রীষ্মকালের দুপুরে একটা নড়বড়ে কাঠের প্লাটফর্মে চেপে খালি গায়ে, টোকা মাথায় শিল্পী ছেনী আর হাতুড়ি হাতে রূপ খুঁজছেন। স্বেদবিন্দু জ্বলজ্বল করছে কালো কাঁধের স্ফীত পেশির ওপর। মূর্তি আর শিল্পী মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা। মাঝে মাঝে নেমে এসে নির্মীয়মাণ মূর্তির চারপাশে ঘুরছেন আর মাথা ডাইনে বা বাঁয়ে হেলিয়ে তাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছেন। তারই মধ্যে হঠাৎ কখন জোর গলায় গেয়ে উঠছেন গুরুদেবের গান, "আবার আমায় পাগল করে দিবে কে।" মাথার ওপর সূর্য থেকে আগুন ঝরছে যেন। রক্তাভ খোয়াই থেকে

হুহু করে ছুতে আসছে আগুনের হলকা। আর সেই নিদাঘের নির্জনতায় আত্মভোলা এক শিল্পী সৃষ্টির আগুন নিয়ে আপন মনে খেলছেন। প্রত্যক্ষদর্শী মুগ্ধ হয়েছিলেন। মুগ্ধ হওয়ার মতোই দৃশ্য ! মহান শিল্পীর প্রাণের এই অনাবিল আনন্দ রূপ পেয়েছিল তাঁর সৃষ্টিতে। ১৯৩৪ সালে শান্তিনিকেতনের কলাভবনে স্থায়ীভাবে যোগ দেন রামকিঙ্কর। এরপর শুরু হয় তাঁর বিপুল বিচিত্র সৃষ্টির পর্ব। জল রঙে, তেল রঙে, নিসর্গ চিত্র, প্রতিকৃতি, আশপাশের মনুষদের জীবন নিয়ে নানা ধরণের কম্পোজিশন। সেই সঙ্গে ভাস্কর্য চর্চা। প্রথমে গোবর, মাটি, আলকাতরা দিয়ে শ্যামলী। পরে কালবাড়ীর কোলাবাড়ীর দেওয়ালে রিলিফ বুদ্ধ। ক্রমশ শুরু হলো সিমেন্ট কংক্রিটের কাজ তাঁর মৌলিক আঙ্গিকে। সুজাতা, সাঁওতাল পরিবার, কলের বাঁশি, ধানঝাড়াই, বুদ্ধ – একের পর এক সৃষ্টি করে চলেন তিনি। মহর্ষি ভবনের মন্দিরের কাছে করা তাঁর 'আলোর ঝাড়' আমাদের দেশের ভাস্কর্যের জগতে প্রথম অ্যাবস্ট্রাক্ট কাজ। এ কাজ যখন তিনি করেন তখন বিশ্বভারতীতে তিনি প্রতিষ্ঠিত অধ্যাপক। আশ্রমগুরু রবীন্দ্রনাথের স্নেহধন্য। মাথায় শিল্পাচার্য নন্দলালের আশীর্বাদ। বাংলার বাইরেও বহু জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছে তাঁর খ্যাতি।

সাঁওতাল পরিবার

কিন্তু অর্থ, মান, যশ কোন কিছুর পরোয়া করতেন না উদাসীন এই শিল্পী। ১৯৫৪ সালে ভারত সরকার তাঁকে ললিত কলা একাডেমির সদস্য নির্বাচন করেন। ১৯৫৮ সালে দিল্লীর প্রগতি ময়দানে বিজ্ঞান মঞ্চ অলংকরণের দায়িত্ব পান। ১৯৭০ সালে পান পদ্মভূষণ উপাধি। এ খবর শুনে নানা শুভার্থী জড়ো হন তাঁর বাড়ীতে। পুরস্কার প্রাপ্তির বিষয়ে তাঁকে প্রশ্ন করা হলে তিনি নাকি জবাব দেন – আওয়ার্ডেড পদ্মশ্রী। সমবেত সকালে হেই হেই করে ওঠে পদ্মশ্রী নয় পদ্মভূষণ। শিল্পী কিন্তু অবিচলিত। হাসিমুখে মন্তব্য করেন – ওই হলো, যা শ্রী তাই ভূষণ। ১৯৭৭ সালে বিশ্বভারতী তাদের সর্বোচ্চ সম্মান দেশিকোত্তম উপাধিতে ভূষিত করেন তাঁকে। ১৯৭৯ সালে সাম্মানিক ডিলিট উপাধি পান রবীন্দ্রাভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। বাইরে থেকে সম্মান যেমন পেয়েছেন আঘাতও পেয়েছেন তেমনি। গৃহীত হয় নি তাঁর অনেক মহার্ঘ কাজ। এক আন্তর্জাতিক ভাস্কর্য প্রতিযোগিতার জন্য পাঠানো ধানঝাড়া বা শ্রম মূর্তিটির ম্যাকেট, কলকাতার শ্যামবাজারের পাঁচমাথার মোড়ের জন্য পাঠানো নেতাজীর ম্যাকেট, জ্ঞানপীঠ পুরস্কারের জন্য পাঠানো বাগদেবী ফেরত আসে বর্জনের লাঞ্ছনা নিয়ে। এসব অসম্মান স্বভাব সুলভ ঔদার্য্যে হেসে উড়িয়ে দিয়েছেন তিনি। কিন্তু যে বেদনা তাঁকে দহন করেছে অহরহ তা হল কাজ না করতে পারার গভীর যন্ত্রণা। সে বেদনার সোচ্চার প্রকাশ ছিল না। নীরবতায় বন্দী রেখেছেন নিজের গভীর বেদনা, কখনো প্রবল প্রাণশক্তিতে হাসির তোড়ে উড়িয়ে দিয়েছেন তাকে। আজকের এই বিজ্ঞাপনের নিয়ন আলোয় চোখ ঝলসানির দিনে রামকিঙ্করের মতো রূপতাপস রূপদক্ষ এক উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। অভিমান তাঁরও হত। জীবনের কোন বিশেষ মুহূর্তে তা প্রকাশও পেত হয় তো। ১৯৭৩ থেকে ১৯৭৫-এই কয়েক বছর তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছিল কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের। খোয়াইয়ে পলাশ ফোটার ঋতুতে জোৎস্না রাতে চাঁদের আলোয় আত্মহারা হয়ে যেতেন কবি ও ভাস্কর।

এইসময় একদিন শিল্পীর বাড়ীতে রিকশা করে এসে হাজির কবি। রিকশা দাঁড় করিয়ে রেখে তাঁর কিঙ্করদার বাড়ীতে ঢুকলেন শক্তি। শিল্পীর প্রশ্নের উত্তরে বললেন যে তিনি অন্য কোন কাজে নয়, তাঁর সঙ্গে দেখা করতেই এসেছেন। রিকশা এমনিই দাঁড় করিয়ে রেখেছেন। রামকিঙ্কর আহত হয়েছিলেন বোধহয়। বলেছিলেন, "হ্যাঁ, সেটা ঠিক। ভালো না লাগলে কেটে পড়তে পারবে। বুড়োমানুষের কাছে আজকাল আর কেউ আসে না। বেশ আছি। একা-একা।" ১৯০৬ সালে বাঁকুড়ার যুগীপাড়ায় যে প্রাণ এসেছিলো পৃথিবীতে ১৯৮০ সালের ২রা আগস্ট মহানগরের রোগশয্যায় সে প্রাণের স্পন্দন স্তব্ধ হল। জীবনাবসান হল রামকিঙ্কর বেইজ নামের মানুষটির। কিন্তু তাঁর শিল্প ? কালের পাহারা এড়িয়ে তা বেঁচে রইলো। শুধু যে বেঁচে রইলো তা নয়, উত্তরকাল পরম শ্রদ্ধায় দেখল তাঁর সৃষ্টি। নতুন করে আবিষ্কার করল তাঁর ভাস্কর্যের বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য। ১৯৮০ সালে তাঁর মৃত্যুর পরে বিড়লা একাডেমিতে আয়োজিত এক শোকসভায় ডঃ নীহাররঞ্জন রায় বলেন যে রামকিঙ্করের মতো নির্মোহ শিল্পী তিনি জীবনে দেখেন নি। "রামকিঙ্কর ছিলেন নিমগ্নচিত্ত, বাঁধনহীন এক মানুষ। সেই মানুষটিকে চিনলেই তাঁর কাজগুলিকে বুঝতে অসুবিধে হবে না। কারণ তার কাজ ও তিনি ছিলেন একাত্ম।" এই একাত্ম আত্মমগ্নতাই বিজ্ঞাপনের চমক ছাড়াই তাঁর সৃষ্টির প্রতি ভাবীকালকে করে তুলেছে শ্রদ্ধান্বিত। আমি আমার নিছক আগ্রহী দর্শকের চোখে তাঁর ভাস্কর্যগুলি দেখে অভিভূত হই বারবার। জড়বস্তুর মধ্যেও যে শক্তিধর শিল্পী অনুভূতির এমন আদিম, নগ্ন, প্রলেপহীন, বেদনাসিক্ত অভিব্যক্তি ফুটিয়ে তুলেছেন ভাস্কর্যশিল্পের সেই মহান স্রষ্টা রামকিঙ্করের উদ্দেশ্যে ভক্তিতে নতজানু হই।

ঋণ স্বীকার :

শিল্পী রামকিঙ্কর আলাপচারি – সোমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

রামকিঙ্কর অন্তরে বাহিরে – সম্পাদনা প্রকাশ দাস

কবিতার পংক্তির উদ্ধৃতি :

খোদাই – শ্রীজাত

রঞ্জিতা চট্টোপাধ্যায় – শিকাগোর বাসিন্দা। পেশায় শিক্ষিকা। আর নেশায় পড়ুয়া। বাংলা এবং ইংরেজি দুই ভাষাতেই লেখাপড়া করার অভ্যাস আপাতত। রঞ্জিতার প্রেম হল বাংলা ভাষা, সাহিত্য আর মাঝে মাঝে কিছু লেখালিখি। রঞ্জিতা 'বাতায়ন' পত্রিকার সম্পাদিকা। গত কয়েক বছর ধরে আমেরিকার বিভিন্ন 'লিটল ম্যাগাজিনে' ওনার লেখা বের হচ্ছে। শিকাগোর স্থানীয় সাহিত্যগোষ্ঠী উন্মেষের সঙ্গে উনি প্রায় এক দশক ধরে যুক্ত। সহলেখিকা হিসেবে রঞ্জিতার দুটি বই এযাবৎ প্রকাশিত হয়েছে – ''Bugging Cancer'' আর ''Three Daughters Three Journeys''। সাহিত্যের হাত ধরে ভৌগোলিক সীমানার বেড়া ভাঙায় বিশেষ আস্থা রঞ্জিতার।

প্রদীপ্ত গুপ্তরায়

কৃষ্ণ গহ্বর (Black Holes)

প্রথমেই পদার্থবিদ্যা জগতের একটা সাম্প্রতিক উল্লেখযোগ্য ঘটনার কথা উল্লেখ করছি। বিষয়টি তাত্ত্বিক দিক থেকে প্রায় একশ বছরের 'পুরোনো' কিন্তু তা পরীক্ষামূলক ভাবে প্রমাণ হল গত ২০১৫ সালের ১৪ই সেপ্টেম্বর। এই ঘটনাটি পদার্থবিদ্, বিশেষ করে জ্যোতিরপদার্থবিদদের মধ্যে বিরাট আলোড়ন ফেলে দিয়েছে। পদার্থবিদ্যার অনেক প্রশ্নের দীর্ঘদিন অমিমাংশিত থাকার মতো এই ঘটনাটিও অনেকদিন অমিমাংশিত ছিল। বর্তমানে কয়েক বছর ধরে বিষয়টি ভীষণভাবে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে।

ঘটনাটা এইরকম — লুইজিয়ানা এবং ওয়াশিংটনের বিজ্ঞানীরা দুটো বিশাল সনাক্তকারক বা ডিটেক্টরের সাহায্যে মহাকর্ষ তরঙ্গ নিয়ে কাজ করার জন্য তৈরী হচ্ছিলেন। হঠাৎ সেই ডিটেক্টরগুলোতে একটা অদ্ভুত শব্দ শোনা গেল। শ্রবণযোগ্য করার পর দেখা গেল, এটা যেন একটা মৃদু, নিচু-পর্দায় আঘাতের শব্দ। পাঁচমাস পরে এই দুই সনাক্তকারকের পাওয়া তথ্য বিশ্লেষণ করে লেজার ইন্টারফেরোমিটার গ্র্যাভিটেশনাল ওয়েভ অবসারভেটরী বা সংক্ষেপে লাইগো (Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory or LIGO) সর্বসমক্ষে ঘোষণা করে, এই আঘাতের শব্দ বহুদূরে অবস্থিত দুটো কৃষ্ণ গহ্বরের একত্রিত হয়ে এক বড় কৃষ্ণ গহ্বরে পরিণত হবার প্রতিধ্বনি। লাইগো গণনা করে যা জানিয়েছে তা হল, এই আঘাতের শব্দ এক লক্ষ কোটি (Billion) বছর আগে সূর্যের চাইতে প্রায় তিরিশগুণ ভারী দুটো কৃষ্ণ গহ্বরের মিলিত হবার প্রতিধ্বনি। ধাক্কার সময় প্রায় তিনটে সূর্যের ভরের সমান শক্তি এই দুই কৃষ্ণ গহ্বর থেকে মহাকর্ষীয় বিকিরণ হিসাবে বাষ্পীভূত হয়ে গেছে। এই আবিষ্কার পদার্থবিদ মহলে আলোড়ন ফেলার কারণ লাইগো সনাক্তকারক এমন একটা কিছু সনাক্ত করেছে যা আমরা কয়েক দশক ধরে দেখার স্বপ্ন দেখছিলাম।

বিজ্ঞানের ছাত্র হিসাবে আমরা প্রশ্ন করতে পারি, লাইগো সনাক্তকারক কিভাবে নিশ্চিত হল যে এই আঘাতের শব্দ এক লক্ষ কোটি বছর আগের কৃষ্ণ গহ্বরের মিলিত হবার প্রতিধ্বনি ? উত্তর দিতে গেলে আমাদের পারিপার্শ্বিক কয়েকটা বিষয়ে নজর রাখতে হবে — প্রথমত, দুটো সনাক্তকারকেই একই ধরণের সঙ্কেত পাওয়া গিয়েছে। দ্বিতীয়ত, কাছাকাছি সময়ে মহাকাশে এমন কোনো ঘটনা ঘটেনি যা এই সঙ্কেতকে বিশ্লেষণ করতে সাহায্য করবে। তৃতীয়ত, অতীতের চাইতে প্রযুক্তির উন্নতি এই সঙ্কেত নির্ণয় করতে সাহায্য করেছে। চতুর্থত, আমাদের জ্যোতিরপদার্থবিদ্যার যা জ্ঞান তাতে এক লক্ষ কোটি বছর আগের কৃষ্ণ গহ্বরের মিলিত হবার ঘটনার সঙ্কেত বর্তমানে সনাক্ত করার সাথে বিরোধ হচ্ছে না। পঞ্চমত, ২৫ ডিসেম্বর ২০১৫ এবং ৪ জানুয়ারী ২০১৭ লাইগো দ্বিতীয় এবং তৃতীয় ঘটনার কথা জানায়। এই দুটো ঘটনা আমাদের আরো নিশ্চিত করে একটা বিষয়ে — লাইগো দুটো কৃষ্ণ গহ্বরকে একত্রীভূত হতে 'দেখেছিল'। আশার কথা হল, আমরা হয়তো ভবিষ্যতে আরো এই ধরনের ঘটনা দেখতে পাব।

পরবর্তী যে প্রশ্ন আমাদের মনে আসছে, কৃষ্ণ গহ্বর কি ? আর তা মিলিত হবার ঘটনায় বিজ্ঞানী সমাজ এত উৎফুল্ল কেন ? এই কৃষ্ণ গহ্বর কি ও কেন বুঝতে গেলে আমাদের একটু পেছন থেকে আসতে হবে।

'প্রিন্সিপিয়া'র (*Principia*) শেষে নিউটন সূর্য এবং গ্রহের মাঝে মহাকর্ষ বলকে কারণ হিসাবে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, ''এই মহাকর্ষ তাদের মধ্যে যে পরিমাণ কঠিন বস্তু আছে তার সমানুপাতিক, সবদিকে বিস্তৃত এবং দূরত্বের বর্গের ব্যাস্তানুপাতিক।'' নিউটনের সূত্রে দুটো ভাগ আছে। এই দুটো ভাগ নিউটন থেকে আইনস্টাইনের বলবিদ্যার উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। প্রথম ভাগটি ভর সংক্রান্ত। নিউটনের দ্বিতীয় সূত্রের আমরা জানি, $F = m_i a$, যেখানে m_i জাড্য ভর (inertial mass)। আবার মহাকর্ষের সূত্র থেকে পাই, $F = m_g g$ যেখানে m_g মহাকর্ষীয় ভর (gravitational mass)। নিউটন ভেবেছিলেন, এই জাড্য ভর এবং মহাকর্ষীয় ভর সমান নাও হতে পারে অর্থাৎ তফাৎ হতে পারে। কিন্তু

১৮৮৯ নাগাদ ইওটভোস (Eötvös) একটা পরীক্ষার সাহায্যে জানালেন এই দুটো ভর সমান। এই দুই ভর যে সমান — এতে আইনস্টাইন গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। সূত্রের দ্বিতীয় ভাগে আছে, বল দূরত্বের বর্গে কমে যায়। নিউটন এই সূত্রটি পর্যবেক্ষণের সাহায্যে নির্ণয় করেছিলেন। তিনি জানতেন, চাঁদ পৃথিবীর দিকে প্রতি সেকেন্ডে ০.০০৪৫ ফুট এগিয়ে আসছে। এটাও জানতেন যে চাঁদ ও পৃথিবীর কেন্দ্রের মধ্যে দুরত্ব পৃথিবীর ব্যাসার্ধের ৬০ গুণ। এখন যদি মহাকর্ষীয় বল বর্গের ব্যাস্তানুপাত সূত্র (Inverse Square Law) মেনে চলে তাহলে লিকনশায়ারের আপেলটি (যেটি পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে এক পৃথিবী ব্যাসার্ধ দূরে আছে) প্রথম ১ সেকেন্ডে ০.০০৪৫ ফুটের ৩৬০০ গুণ বা ১৬ ফুট পড়বে। এটা পর্যবেক্ষণের সাথে ভালোভাবেই মিলে যায়। নিউটন এই ফল কিন্তু কুড়ি বছর প্রকাশ করেননি। কারণ তাঁর, পৃথিবীর ভর কেন্দ্রে অবস্থিত - এটা খুব সমর্থনযোগ্য মনে হয়নি। কিন্তু রয়েল সোসাইটি কয়েকজন সদস্য, যেমন, এডমন্ড হ্যালি (Edmund Halley), রবার্ট হুক (Robert Hook) ক্রিস্টোফার রেন (Christopher Wren) প্রভৃতি লক্ষ্য করেছিলেন কেপলারের তৃতীয় সূত্র বর্গের ব্যাস্তানুপাত সূত্র মেনে চলে তখনই যখন গ্রহদের কক্ষপথ বৃত্তাকার হয়। প্রকৃতপক্ষে হ্যালীর প্ররোচনায় নিউটন গণনা করে দেখলেন বর্গের ব্যাস্তানুপাত সূত্রে কেপলারের তিনটে সূত্রই মেনে চলে; অর্থাৎ, সূর্যকে কেন্দ্র করে গ্রহরা উপবৃত্তাকার পথে পরিভ্রমণ করছে; তারা সমান সময়ে সমান ক্ষেত্রপথ পরিভ্রমণ করে; এবং সময়ের বর্গ প্রধান অক্ষের ঘনর সাথে সমানুপাতিক। চাঁদ এবং অন্যান্য গ্রহদের গতিপথের ব্যাখ্যা নিউটনের সূত্রের সাহায্যে চমৎকারভাবে করা গেল। উল্লেখযোগ্য যেটা হল নেপচুন গ্রহের আবিষ্কার। নিউটন তাঁর এই আবিষ্কার ১৬৮৬ সালে *Philosophiae Naturalis Principia Mathematica* তে প্রকাশ করেন। দুটো বস্তুর মাঝে দূরত্ব থাকলে অথবা শূন্যস্থান থাকলে কিভাবে এই মহাকর্ষীয় বল কাজ করে তার কোনো ব্যাখ্যা পাওয়া যায় নি।

কিন্তু একটা সমস্যা দেখা গেল। বুধের গতিপথ গণনা করে দেখা গেল, নিউটনের সূত্রের সাহায্যে গণনার চাইতে প্রতি বছরে ৩৫'' (পয়ত্রিশ সেকেন্ড) বেশী দ্রুততায় সূর্যের নিকট হচ্ছে। এই সমস্যা সমাধানের অনেক ধরণের চেষ্টা হয়েছে কিন্তু ১৯১৫-র আগে অব্দি এর সমাধান হয়নি।

নিউটনীয় বলবিদ্যায় আমরা যে জ্যামিতি ব্যবহার করি সেটা ত্রিমাত্রিক ইউক্লিডীয় স্থানিক জ্যামিতি (Three dimensional Euclidean Space Geometry)। আর সময় শাশ্বত (Eternal)। মহাবিশ্বকে আমরা এক বিশাল বাক্স হিসাবে কল্পনা করতে পারি যার ভেতরে সমস্ত বস্তু সমবেগে গতিশীল। আর যে নির্দেশ তন্ত্র আমরা ব্যবহার করি সেই নির্দেশ তন্ত্রের ক্ষেত্রে যে নাম দেওয়া হয় জাড্য নির্দেশ তন্ত্র (Inertial Frame of Reference)। জাড্য নির্দেশ তন্ত্র কি সেই প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে নিউটন এক পরম স্থানের (Absolute Space) কল্পনা করেন যেখানে এই জাড্য নির্দেশ তন্ত্র স্থির অবস্থায় আছে অথবা পরম স্থানের সাপেক্ষে সমবেগে গতিশীল রয়েছে। এই সব নির্দেশ তন্ত্রের সাপেক্ষে পদার্থবিদ্যার বিভিন্ন সূত্রর বৈশিষ্ট্য আমরা বোঝার চেষ্টা করি। অর্থাৎ, এখানে নির্দেশ তন্ত্র এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তবে এই পরম স্থানের ধারণা তখনকার সব বিজ্ঞানী, দার্শনিকের কাছে গৃহীত হয়নি। এটা নিয়ে তর্ক চলেছে।

আরো একটা বিষয় ১৮৬৪ সালে পদার্থবিদ্যায় বিরাট আলোড়ন এনে দিল। ম্যাক্সওয়েলের তড়িৎগতিবিদ্যা। ম্যাক্সওয়েলের সমীকরণের সাহায্যে গণনা করে শূন্যে আলোর গতিবেগ 'c' র এক নিদিষ্ট মান পাওয়া গেল। তড়িৎগতিবিদ্যা এই জাড্য নির্দেশ তন্ত্রের আপেক্ষিকতার (যাকে আমরা গ্যালিলীয় আপেক্ষিকতা বলি) নিয়মকে সন্তুষ্ট করলনা। অর্থাৎ আলোর গতিবেগ যদি কোনো স্থির মাধ্যমে 'c' হয়, 'v' বেগে চলমান কোনো মাধ্যমের সাপেক্ষে আলোর গতিবেগ গ্যালিলীয় আপেক্ষিকতা অনুসারে সর্বোচ্চ 'c+v' বা সর্বনিম্ন 'c-v' হবে। কিন্তু বাস্তবে তা হয় না। আলোর গতিবেগ 'c' থাকে। ম্যাক্সওয়েল নিজেও ভেবেছিলেন তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গ এক সর্বব্যাপী মাধ্যম, ঈথার, দ্বারা পরিবাহিত হয়। আর এই তড়িৎগতিবিদ্যার সমীকরণগুলো, তাঁর ধারণায়, নিদিষ্ট কিছু পরস্পরের সাপেক্ষে স্থির গ্যালিলীয় জাড্য নির্দেশ তন্ত্রেই মান্যতা পায়।

সূর্যের সাপেক্ষে পৃথিবীর গতিবেগ ৩০ কি.মি/সেকেন্ড এবং আমাদের ছায়াপথের কেন্দ্রের সাপেক্ষে ২০০ কি.মি/সেকেন্ড থাকা সত্ত্বেও ঈথারের অস্তিত্ব এবং এর সাপেক্ষে পৃথিবীর গতিবেগ মাপার বিভিন্ন চেষ্টা বিফলে গেল। এদের মধ্যে সবচেয়ে

গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষাটি করেছিলেন ১৮৮৭ সালে মাইকেলসন ও মর্লি । ব্যবহারিক পদার্থবিদদের ক্রমাগত ঈথার নিয়ে ঋণাত্মক তথ্য ঈথার-বিশ্বাসী বিজ্ঞানী যেমন ফিটজগেরাল্ড (Fitzgerald), লরেঞ্জ (Lorentz), পঁয়কারে (Poincaŕe), প্রভৃতি বিশ্বাস করতে বাধ্য হলেন বাস্তবে ঈথারের ড্রিফট বেগ পর্যবেক্ষণ করা যায় না । তড়িৎগতি বিদ্যা এবং বলবিদ্যা আপেক্ষিকতার এইসব অসুবিধার এক নির্দিষ্ট সমাধান আইনস্টাইন দিলেন ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদ তত্ত্বে ।

বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদ তত্ত্ব দুটো স্বতঃসিদ্ধর ওপর দাঁড়িয়ে আছে । ১) আলোর গতিবেগ ধ্রুবক । ২) কোনো স্থির নির্দিষ্ট তন্ত্রের অস্তিত্ব নেই । গতির যে ধারণা আমরা এখানে কাজ করছি সেখানে কোনো স্থির তন্ত্র নেই বরং এক তন্ত্রর সাপেক্ষে অন্য তন্ত্র সমবেগে গতিশীল । অন্যভাবে বলতে গেলে গতি চরম নয়, আপেক্ষিক । তড়িচ্চুম্বক তত্ত্বকে মাথায় রেখে নির্দেশ তন্ত্রের এক বড় ধরণের পরিবর্তন করা হল — ত্রিমাত্রিকের বদলে চতুর্মাত্রিক — তিনটে স্থান মাত্রার সাথে কাল মাত্রাকেও যোগ করা হল । অর্থাৎ এখন হল 'স্থান-কাল' মাত্রা (Space-Time Coordinates) । এই স্থান-কাল মাত্রা কিন্তু সমতল । এক তন্ত্রর সাপেক্ষে অন্য তন্ত্রে পদার্থবিদ্যার সূত্রের যে পরিবর্তন তা বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদে লরেঞ্জ পরিবর্তন সূত্রের যে পরিবর্তন তা বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদে লরেঞ্জ পরিবর্তন সূত্রের (Lorentz transformation Equations) সাহায্যে মাপা যায় । একটা উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা বোধহয় কিছুটা পরিষ্কার হবে । ধরা যাক একটা চলন্ত ট্রেনের সামনে এবং পেছনে একজন করে পর্যবেক্ষক 'ক' ও 'খ' আছেন । ক এবং খ যদি ট্রেনের গতির দিকে কোনো আলোর সংকেত পাঠান, তাহলে আমরা জানি এই দুটো সংকেতই একই গতিবেগে সামনের দিকে যাবে । এবার ট্রেনটা যদি আলোর গতির ০.৯৯ গুন গতিতে চলে তাহলে কি 'ক'-এর কাছে আলোর বেগ ১.৯৯ গুণ হবে ? লরেঞ্জ পরিবর্তন সূত্রের সাহায্য গণনা করলে এর মান কখনোই 'c' র বেশী হবে না ।

কিভাবে এই ঘটনা ঘটে ? উত্তর হল, 'ক' এবং 'খ' দুজনেই আলাদাভাবে সময়ের পরিবর্তন মেপেছেন এবং সাথে দৈর্ঘ্য ও মেপেছেন । এবার তাঁরা এই মাপগুলো লরেঞ্জ পরিবর্তন সূত্রে ফেলে দেখেছেন একতন্ত্রের সাপেক্ষে অন্য তন্ত্রে স্থান এবং কালের কি ধরনের পরিবর্তন হয় । এক্ষেত্রে 'ক' এবং 'খ' নিজেকে অন্যজনের সাপেক্ষে স্থির মনে করছে; অর্থাৎ যিনি পর্যবেক্ষক তিনি স্থির অন্যজন সমবেগে গতিশীল ।

নিউটনের সূত্রের ক্ষেত্রে আমরা ইউক্লিডীয় জ্যামিতি ব্যবহার করতাম আর বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদে আমরা মিনকাউস্কি জ্যামিতি ব্যবহার করব । এই দুই জ্যামিতির তফাৎ হল, প্রথমটি ত্রিমাত্রিক স্থানিক জ্যামিতি (Three Dimensional Geometry) আর অন্যটি চতুর্মাত্রিক স্থান-কাল জ্যামিতি (Four Dimensional Space-time Geometry) । নিউটনীয় বলবিদ্যার সমীকরণগুলোকে আমরা বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদের নিরিখে পরিমার্জন করে ব্যবহার করি ।

বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদে স্থান-কাল শূণ্য (Empty) অবস্থায় থাকে । পর্যবেক্ষক এবং আলোক রশ্মি এর মধ্যে যাতায়াত করে, আর আমরা দুটো ঘটনার মাঝে সময়ের পার্থক্য মাপি, দুটো বস্তুর মাঝে দূরত্ব মাপি । এই সব মাপের ক্ষেত্রে আমাদের মাথায় থাকে যথাযথ সময় (Proper Time), যথাযথ দৈর্ঘ্য (Proper Length), সময়ের প্রসারণ (Time Dilation), দৈর্ঘ্য সংকোচন (Length Contraction) ইত্যাদি বিষয়ে । সব গতিই আপেক্ষিক — এই ধারণার প্রধান বিশ্বাস হল প্রকৃতপক্ষে স্থান-কাল কতটা শূণ্য । বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদে আমাদের সব গণনার ক্ষেত্রে স্থান-কাল পরোক্ষ ভূমিকা গ্রহণ করে । কিন্তু সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ স্থান-কাল প্রত্যক্ষ ভূমিকা নেয় । ভারী বস্তুর উপস্থিতিতে স্থান-কাল বক্রতা প্রাপ্ত হয় । এই বক্রতা কতটা হবে তা নীচে লেখা আইনস্টাইনের ক্ষেত্র সমীকরণ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় —

$$R_{\mu\nu} - \frac{1}{2} g_{\mu\nu} R = -8\pi G T_{\pi\nu}$$

ওপরের সমীকরণটি এক বিশেষ গাণিতিক পদ্ধতিতে লেখা যাকে টেনসর পদ্ধতি বলা যেতে পারে । এখানে $R_{\mu\nu}$ চতুর্মাত্রিক স্থান-কাল বক্রতা, টেনসর, R বক্রতা স্কেলার, $g_{\mu\nu}$ কে মেট্রিক টেনসর বলা হয় । μ বা ν এর মান ০, ১, ২, ৩

হতে পারে। ০ সময়কে এবং ১, ২, ৩ স্থানকে বর্ণনা করে। $T_{\mu\nu}$ হল স্ট্রেস-এনার্জী টেনসর এবং এটাই বস্তুর উপস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করে। শূন্যস্থানে $T_{\mu\nu} = 0$; প্রকৃতপক্ষে এই স্ট্রেস-এনার্জী টেনসরে ভর, শক্তি, চাপ এবং কৃন্তন পীড়ন (Shear Stress) — এই সব বিষয়ই থাকে। G নিউটনের মহাকর্ষ ধ্রুবক। এটি, কত গভীরভাবে কোন বস্তু স্থান-কালকে প্রভাবিত করে, সেটা বলে। ডানদিকের ঋণাত্মক চিহ্ন ক্ষেত্রের আকর্ষণ ব্যাপারে বোঝায়। সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ মহাকর্ষ ক্ষেত্র স্থান-কালের সাথে প্রত্যক্ষ ভাবে যুক্ত। যেটা নিউটনের মহাকর্ষ সূত্রে অনুপস্থিত। যখন $\mu = v = 0$, আইনস্টাইনের মহাকর্ষ সমীকরণ নিউটনের সমীকরণে পরিণত হয়। বস্তুর উপস্থিতিতে স্থান-কালের বক্রতা কেমন ভাবে পরিবর্তিত হতে পারে তা ১ নং ছবিতে দেখানো হয়েছে।

প্রশ্ন উঠতে পারে, স্থান-কালের প্রত্যক্ষ ভূমিকা সত্ত্বেও ভূমিকা সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ কিভাবে বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদ অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে ? উত্তর এমন হতে পারে, বেশীরভাগ ক্ষেত্রে মহাকর্ষ ক্ষেত্র খুব দুর্বল। যদি আমরা এই ক্ষেত্রকে উপেক্ষা করতে পারি তাহলে মিনকাউস্কি স্থান-কালে যাব যেখানে কোনো বক্রতা নেই, যেখানে বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদ কাজ করে এবং বিভিন্ন নির্দেশ তন্ত্র সমতুল্য (Equivalent)। কিন্তু মহাকর্ষের উপস্থিতিতে বিভিন্ন নির্দেশ তন্ত্রের সমতুল্যতা হারিয়ে যায় কারণ, মহাকর্ষীয় বস্তু কোনো নির্দেশ তন্ত্রকে বিশেষ অবস্থায় পরিণত করে। যদি মহাকর্ষ উপস্থিত থাকে, তাহলেও খুব ছোট স্থান-কালে আমরা বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদ ব্যবহার করতে পারি, যেহেতু মহাকর্ষ ক্ষেত্র খুব দুর্বল।

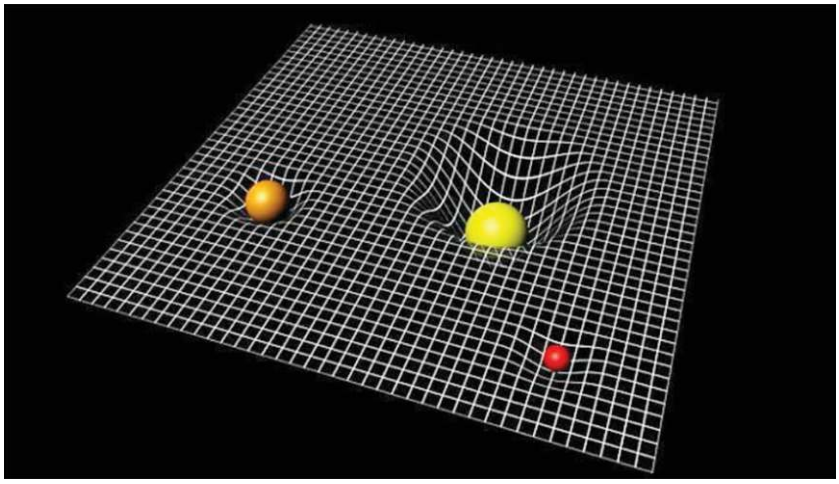

১নং ছবি : বস্তুর উপস্থিতিতে স্থান-কালের বক্রতা

সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদের সাহায্যে যেটা আমরা বুঝতে পারি তা হল, বস্তু ঠিক করবে কিভাবে স্থান-কাল বক্রতা পাবে এবং এই বক্রতার ফলে বস্তু কেমন গতিপ্রাপ্ত হবে সেটা আবার সর্বাপেক্ষা যথাযথ সময়ের তত্ত্বের (Theory of Optimal Proper Time) ওপর নির্ভর করে। এটা যেন অনেকটা তড়িচ্চুম্বকীয় তরঙ্গের মতো। তড়িচ্চুম্বকীয় তরঙ্গের ক্ষেত্রে যেমন আধানের গতিবেগের ধরণ তড়িৎ ক্ষেত্র এবং চুম্বক ক্ষেত্রের প্রকৃতির ওপর নির্ভর করে ঠিক সেইরকম বস্তুর গতির ওপর স্থান-কালের বক্রতার পরিবর্তন নির্ভর করে। ফলে একধরণের তরঙ্গের সৃষ্টি হয় যাকে আমরা মহাকর্ষীয় তরঙ্গ বলতে পারি। লাইগো এই মহাকর্ষীয় তরঙ্গের সনাক্তকারক হিসাবে কাজ করছে।

এবার আমরা আবার সেই প্রশ্নে ফিরে আসি। কৃষ্ণ গহ্বর কি ? এককথায় বললে বলা যায়, এটি স্থান-কালের এমন একটা অংশ যেখানে বস্তু এবং শক্তি আকৃষ্ট হয় এবং যেখানে থেকে এদের বেরিয়ে আসা অসম্ভব। কৃষ্ণ বা কালো বলতে আমরা বুঝি যেখানে আলো বা শক্তি শোষিত হয় অর্থাৎ সে জায়গাটা আমরা দেখতে পাইনা। আর গহ্বর বা গর্ত হল এমন এক জায়গা যেখানে বস্তুর কেবল নীচের দিকে গতিপ্রাপ্ত হয়। তাত্ত্বিকভাবে আইনস্টাইন তত্ত্বের সমাধানের পর প্রথম কৃষ্ণগহ্বরের প্রস্তাবনা করেন সোয়ার্জসচাইল্ড (Schwarzshild) বিন্দুভরের অবস্থানের ফলে স্থান-কালের বক্রতা এবং এই বক্রতার পরিণতি কৃষ্ণগহ্বর।

এই প্রস্তাবনায় একটা ধারণার জন্ম নেয় – ইভেন্ট হরাইজন (Event Horizon) । কৃষ্ণগহ্বরের ইভেন্ট হরাইজন বা 'ঘটনা দিগন্ত' থেকে কোনো সংকেত বেরোতে পারবে না এবং সময় ঐ দিগন্ত থেকে ব্যাসার্ধ বরাবর ভেতরের দিকে নির্দেশিত হবে । কৃষ্ণগহ্বর থেকে দূরে স্থানকালের বক্রতা অল্প হয় । আরো একটা ধারণা আমরা কৃষ্ণগহ্বরের ক্ষেত্রে করে থাকি – ল্যাপ্স ফাংশন (Lapse Function) বা বিচ্যুতি আপেক্ষক । ইভেন্ট হরাইজনে বা ঘটনা দিগন্তে এই ফাংশন বা আপেক্ষকের মান ০ । এর মানে ঘটনা দিগন্তে সাধারণ সময়ের মান শূন্য । হরাইজন বা দিগন্ত থেকে অনেক দূরে এই আপেক্ষকের মান ১ । বিচ্যুতি আপেক্ষক ০ থেকে ১ এর মধ্যে মসৃণভাবে পরিবর্তিত হয় । দিগন্ত থেকে আমরা যত সময়ের সাথে এগিয়ে যাব অর্থাৎ ব্যাসার্ধ বরাবর ভেতরের দিকে যাব বৃত্তের পরিধি কমতে থাকবে এবং একটা সময়ে আমরা এমন এক অবস্থায় আসব যাকে বিজ্ঞানের ভাষায় ' সিঙ্গুলারিটি' বলা যায় । এই 'সিঙ্গুলারিটি' এমন একটা ব্যাপার যেখানে কোনো আপেক্ষক অনির্ণীত থাকে । এই সিঙ্গুলারিটিকে সোয়ার্জসচাইল্ড সিঙ্গুলারিটি বলা হয় । কৃষ্ণ গহ্বরের মধ্যে প্রবেশ করলে কোনো বস্তুর খুব দ্রুত পরিবর্তন হতে থাকে এবং দ্রুত সিঙ্গুলারিটির দিকে এগিয়ে যায় । কৃষ্ণ গহ্বরের মহাকর্ষীয় আকর্ষণ খুব দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং সিঙ্গুলারিটিতে আঘাত করার ১০ থেকে ১০০ মাইক্রোসেকেন্ডের মধ্যে বস্তুটি ভাঙতে শুরু করে । বাড়তে থাকা মহাকর্ষীয় তরঙ্গের জোয়ারের বলের ফলে ভাঙা বস্তুর অংশগুলো আরো বিচ্ছিন্ন হতে থাকে, আরো ছোটো হতে থাকে এবং অবশেষে এর প্রাথমিক উপাদানে ইলেকট্রন, প্রোটন ও তারপরে কোয়ার্ক, গ্লুয়োন ইত্যাদিতে ভেঙে যায় । তারপরে কি হয় সেটা বলা সম্ভব হবে না কারণ এই কণাগুলো বিন্দুবৎ । বিন্দুর চাইতে ছোট কিছু কি হতে পারে বাস্তবে ? কেমনভাবে কোনো বস্তু কৃষ্ণগহ্বর দ্বারা আকর্ষিত হয়ে পতিত হয় সেটা দুইনম্বর ছবিতে দেখানো হয়েছে ।

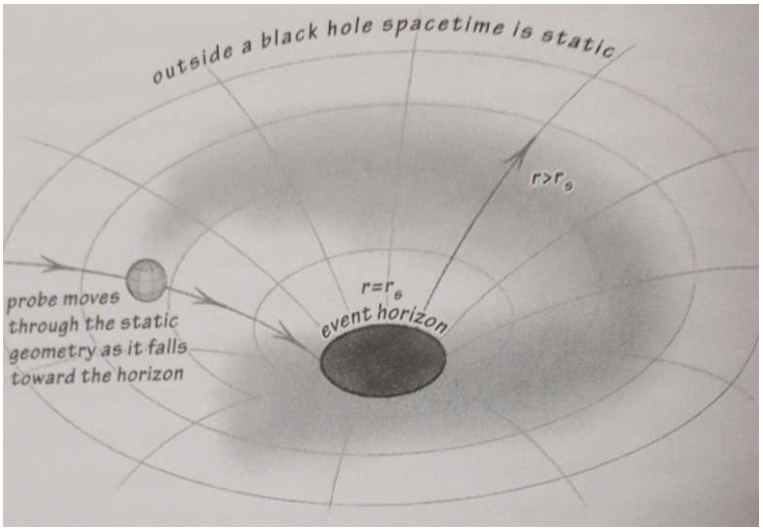

২নং ছবিঃ কৃষ্ণগহ্বরের আকর্ষণে বস্তুর পতন

কতটা হতে পারে একটা কৃষ্ণগহ্বরের ভর ? একটা আন্দাজ করার চেষ্টা করি । আমরা যে গ্যালাক্সিতে বাস করি, মিল্কি ওয়ে গ্যালাক্সি, তার কেন্দ্রে একটা কৃষ্ণগহ্বর আছে । এর ভর চল্লিশ লক্ষ সৌরভরের সমান । এত ভারী হবার কারণেই স্থান-কাল বক্র হয়ে পড়ে ।

ঘটনা দিগন্তের ভেতরে এত টালমাটাল, এত উদ্দামতা । কিন্তু তার কোনো প্রভাব ঘটনা দিগন্তের বাইরে থেকে দেখা যায়না । প্রকৃতপক্ষে কৃষ্ণগহ্বরের অন্যান্য সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে এটাও অন্যতম বৈশিষ্ট্য । সোয়ার্জসচাইল্ড কৃষ্ণগহ্বর একধরনের অনাবর্তিত (nonrotating) কৃষ্ণগহ্বর । আরেক ধরনের কৃষ্ণগহ্বর আছে, যার নাম কের কৃষ্ণগহ্বর (Kerr Black Holes), যারা আবর্তিত কৃষ্ণগহ্বর । আবার কিছু কৃষ্ণগহ্বরের আধান আছে । কোন ধরনের কৃষ্ণগহ্বর হবে তা তার ভর, আধান এবং স্পিন বা ঘূর্ণনের ওপর নির্ভর করে । অবশ্য কৃষ্ণগহ্বরের এই তিনটে বৈশিষ্ট্য জানা থাকলে এর জ্যামিতিটা খুব ভালোভাবে বোঝা যায় ।

কৃষ্ণগহ্বরে কোনো বস্তু বিলীন হয়ে গেলে তার কিছু কি অবশিষ্ট থাকে ? এই প্রসঙ্গে স্টিফেন হকিং-এর একটা গবেষণার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে । ১৯৭৪ সালে 'নেচার'- পত্রিকায় তিনি একটা গবেষণা পত্র লেখেন । [সূত্র : Black Hole Explosion ? , S.W . Hawking, Nature, 248, pp 30-31 (1st March, 1974)] যাতে তিনি বলেন, কৃষ্ণগহ্বরের গণনার ক্ষেত্রে আমরা সাধারণভবে কোয়ান্টাম ক্ষেত্রেটাকে বাদ দিই । কিন্তু যদি আমরা কোয়ান্টাম ক্ষেত্রকে গণনার মধ্যে আনি, অর্থাৎ ক্ষুদ্র দেশকালকে (আণবিক স্তর বা তারও কম পাল্লা) কৃষ্ণগহ্বরের গণনার ক্ষেত্রে আনা হলে, এক অদ্ভূত ব্যাপার ঘটতে পারে : দেখা যাবে কৃষ্ণগহ্বর ফোটন কিংবা নিউট্রিনো কণা নির্গত করছে ! এই তাপীয় বিকিরণের ফলে কৃষ্ণগহ্বরের ভর কমে যেতে পারে । কৃষ্ণগহ্বরের এই ভর কমার ফলে পৃষ্ঠতলের মহাকর্ষ বল বৃদ্ধি পাবে এবং তার সাথে বিকিরণের হারও বৃদ্ধি পাবে ! এই বিকিরণের ফলে একটা সময়ে মহাশূণ্যে কৃষ্ণগহ্বর বিলীন হয়ে যাবে ! এই বিকিরণকে হকিং বিকিরণ বলা হয় । এই গবেষণাকে পদার্থবিদ্যায় এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ বলা হয় । হকিং-এর এই বড় সময়কালের পাল্লার (Large Scale Structure of space time) সাথে কোয়ান্টাম সময়কালের পাল্লাকে (Quantum Structure of Space time) মেলানো যুগান্তকারী তো বটেই ! হকিং এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে ১৯৭৮ সালে বলেন, ''একজন মানুষ যদি কৃষ্ণগহ্বরে ঝাঁপ দেন, তবে তাঁকে বা তাঁর অণুগুলোকে আমরা ফেরত পাবনা, কিন্তু তাঁর সম্মিলিত ভর এবং শক্তিকে ফেরত পাব ।'' ''ভগবান যদি পাশা খেলেন . . .'' — আইনস্টাইনের এই বিখ্যাত উক্তিটি তিনি সামান্য পালটে দিয়ে বললেন, ''ভগবান মহাবিশ্বকে নিয়ে পাশা খেলেন ঠিকই, কিন্তু মাঝে মাঝে এমনভাবে খেলেন যে সেটা আর খুঁজে পাওয়া যায়না !''

খুব সম্প্রতি কৃষ্ণ গহ্বরের ছবি তোলা সম্ভব হয়েছে । (Black Hole Picture for First time- in spectacular detail: David Castelvecchi, Nature news, 10 April, 2019) ইভেন্ট হরাইজন টেলিস্কোপের রেডিও ডিসের গ্লোবাল নেটওয়ার্কের মাধ্যমে এই ছবি তোলা সম্ভব হয়েছে । (৩ নং ছবি) পেছনে ঘূর্ণীয়মান আলোর সাপেক্ষে কৃষ্ণ গহ্বর এবং তার ইভেন্ট হরাইজন তোলা সম্ভব হয়েছে । ৫৫ মিলিয়ন আলোকবর্ষ দূরে এম ৮৭ নামে যে নক্ষত্রপুঞ্জ আছে তার কেন্দ্রে যে ভারী কৃষ্ণ গহ্বর আছে, এটা তারই ছবি । কাজেই তত্ত্বর সাথে তথ্যের মেলবন্ধন সম্ভব হয়েছে ।

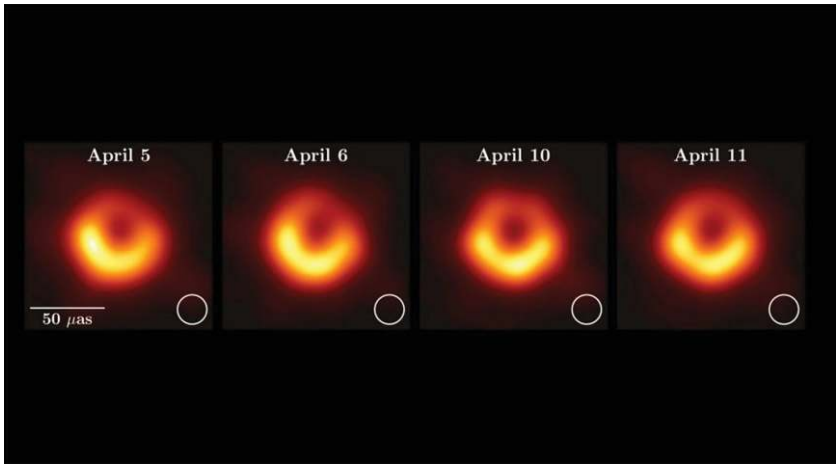

৩নং ছবিঃ কৃষ্ণ গহ্বরের ছবি

যত দিন যাচ্ছে কৃষ্ণ গহ্বর নিয়ে বিজ্ঞানীদের আগ্রহ বাড়ছে । তাত্ত্বিক এবং ব্যবহারিক জ্যোতির্পদার্থ বিজ্ঞানীদের মধ্যে- শুধু জ্যোতির্পদার্থবিজ্ঞানী নয়, বিভিন্ন শ্রেণী বিজ্ঞানীদের মধ্যেও এই নিয়ে উৎসাহ বাড়ছে । শতাব্দীপ্রাচীন একটা সমস্যার দরজা নতুন করে খুলে খাওয়ায় অন্য আগ্রহ তৈরী হয়েছে । আমরা ভবিষ্যতে কতটা এগোতে পারি সেটাই এখন দেখার ।

ডঃ প্রদীপ্ত গুপ্ত রায় – পদার্থবিদ্যায় পি. এইচ. ডি । গবেষণার বিষয় High Energy Heavy Ion Collisions. ইংরেজি এবং বাংলায় বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ও দেশীয় পত্রপত্রিকায় নিয়মিত লেখক । গবেষণা পত্রের সংখ্যা ৭০ । পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর কলেজে দীর্ঘদিন অধ্যাপনার পরে বর্তমানে দমদম মতিঝিল কলেজের অধ্যক্ষ হিসাবে কর্মরত ।

মনীষা বসু

গৌহাটি সফর

২০১৫-সালে দেশে গিয়েছিলাম । দেশ থেকে ফেরার সপ্তাহ খানেক আগে হঠাৎ-ই আমরা ঠিক করেছিলাম দু-দিনের জন্য গৌহাটি যাব কামাখ্যা মায়ের পূজো দিতে । শুনেছিলাম আমার শশুর মহাশয়ের খুব ইচ্ছে ছিল কামাখ্যা মায়ের পুজো দেওয়ার । তবে যে কারণেই হোক ওনার সেই মনস্কামনা আর পূর্ণ হয়নি । যাইহোক গৌহাটি যাব শুনে নানা জনের নানা মত । গৌহাটির মতো এত নোংরা শহর নাকি আর নেই ইত্যাদি । তাছাড়া ভীষণ মশার উপদ্রব । এইসব শুনে একটু ভয় হয়েছিল কি জানি কেমন লাগবে তবে ভেবেছিলাম মাত্র দু-দিন তো থাকব কি আর হবে । আর আমরা তো শশুর মহাশয়ের মনস্কামনা পূর্ণ করতে কামাখ্যা মায়ের পুজো দিতে যাচ্ছি ।

ভালো না লাগলে পুজো দিয়েই চলে আসবো । তবে আমাদের কিন্তু গৌহাটি সফর খুবই ভালো লেগেছিল । অবশ্য আমরা ঠিক গৌহাটি শহরের মধ্যে ছিলাম না । আমাদের হোটেল 'র‍্যাডিসন ব্লু' ছিল গৌহাটি শহর থেকে একটু দূরে কামাখ্যা মন্দিরে যাওয়ার পথে । নতুন ঝকঝকে সুন্দর হোটেল । আশেপাশে কিছু নেই । চুপচাপ শান্ত নিরিবিলি পরিবেশ । এয়ারপোর্ট থেকে গাড়ি নিয়ে বিকেলে হোটেলে পৌঁছেছিলাম । মনে আছে একমাস ধরে কলকাতার ভীড়ভাট্টা, হৈ হট্টগোলের পর ওই শান্ত পরিবেশে মন জুড়িয়ে গিয়েছিল ।

কোথাও যাওয়ার আগে নতুন জায়গাটার সম্বন্ধে একটু পড়াশুনো করে জেনে নেওয়ার অভ্যেস আমার চিরকালের । বেশী সময় নেই তাই চটজলদি ইন্টারনেট্ ঘেঁটে জেনেছিলাম গৌহাটির কিংবদন্তী এবং ইতিহাস বেশ কয়েক হাজার বছরের পুরনো । যদিও গৌহাটি শহরের উৎপত্তির সঠিক ইতিহাস জানা যায়নি, তবু মহাকাব্য, পুরাণ এবং অন্যান্য পরম্পরাগত ইতিহাসে উল্লেখ করা কাহিনী থেকে এটাকে এশিয়ার একটি অন্যতম পুরাতন শহর হিসাবে অনুমান করা হয় । অনেক প্রাচীন মন্দির নিয়ে গঠিত ব্রহ্মপুত্র নদীর তীরে এই পুরনো শহরটির আরও দুটি নাম আছে । একটা হলো 'সিটি অফ দ্যা টেম্পল বা মন্দিরের শহর' আর দ্বিতীয় নামটা হলো 'লাইট অফ দা ইস্ট বা পূর্বের আলো'। বর্তমান কালে গৌহাটি একটি শিল্পশহর, গুরুত্বপূর্ণ নদীবন্দর এবং আসামের বাণিজ্যিক কেন্দ্র । গৌহাটির দিসপুর অঞ্চল আসামের রাজধানী ।

পরেরদিন সকালে উঠে স্নান করে পুজো দিতে গিয়েছিলাম কামাখ্যা মায়ের মন্দিরে । হোটেলের উল্টো দিকে পীচের রাস্তার পাশে বাঁশ ঝাড়ের ভেতর দিয়ে আলোছায়া মাখা কামাখ্যা যাওয়ার মেঠো রাস্তাটা দেখেই ভালো লাগায় মন ভরে উঠেছিল । হোটেল থেকেই গাড়ি নিয়েছিলাম । নীপেন ছিল আমাদের ড্রাইভার কাম গাইড । গাড়িতে সুন্দর পাহাড়ী রাস্তা দিয়ে ঘুরে ঘুরে মন্দিরে ওঠার সময় নীপেন বলেছিল আগে যখন গাড়ির রাস্তা হয়নি তখন খুবই কষ্টদায়ক ছিল মন্দিরের পথ । হোটেল থেকেই মন্দিরের পুরোহিতের ব্যবস্থা করে দিয়েছিল ।

নীলাচল পাহাড়ের ওপরে কামাখ্যা মন্দির । এটি ৫১ সতীপীঠের অন্যতম । ঐতিহাসিক প্রমাণ থেকে জানা যায় যে আলাউদ্দিন হুসেন শাহ কামতা রাজ্য আক্রমণ করার সময় (১৪৯৮ খ্রিষ্টাব্দ) এই মন্দির ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল । কথিত আছে কোচ রাজবংসের প্রতিষ্ঠাতা বিশ্বসিংহ এই ধ্বংসাবশেষ খুঁজে পান । তিনিই এই মন্দিরের পুজোর পুনর্প্রবর্তন করেন । তবে

তার পুত্র নরনারায়ণের রাজত্বকালে ১৫৬৫ খ্রিষ্টাব্দে এই মন্দিরটি নির্মানের কাজ শেষ হয় । পরে অহম রাজ্যের রাজারা মন্দিরটি আরও বড় করে তোলেন । তন্ত্রসাধনার কেন্দ্র হওয়ায় বার্ষিক অম্বুবাচী মেলা অনুষ্ঠানে এখানে প্রচুর ভক্ত আসেন । এছাড়া বার্ষিক মনসা পুজোও মহাসমারোহে আয়োজিত হয় । দুর্গাপুজো কামাখ্যা মন্দিরের একটি অন্যতম প্রধান উৎসব । কামাখ্যা মন্দিরে চারটি কক্ষ আছে । গর্ভগৃহ ও তিনটি মন্ডপ, চলন্ত, পঞ্চরত্ন ও নাটমন্দির ।

মন্দিরের গর্ভগৃহ একেবারে পাহাড়ের নীচে । অনেক সরু খাড়া অন্ধকার সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে জলে হাত ছুঁয়ে সেই জল মাথায় দিয়ে মাকে প্রণাম করেতেই গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠেছিল । মনে হয়েছিল এই সেই কামাখ্যা মা । ছোট থেকে কত গল্প শুনেছি । কিছুতেই যেন বিশ্বাস করতে পারছিলাম না যে সত্যিই কামাখ্যা মায়ের কাছে এসেছি । মন্দির থেকে বের হয়ে আসার পর ওখানকার এক ফটোগ্রাফার আমাদের একটা সুন্দর ছবি তুলে দিয়েছিল । স্টাডির ডেস্কে রাখা ছবিটাতে যখনই চোখ পড়ে মন প্রসন্ন হয়ে উঠে । মন্দির থেকে নেমে যাওয়ার সিঁড়িতে এক বুড়ো নানা রকমের পাথরের থালা সাজিয়ে বসেছিল বিক্রি করার জন্য । ওর কাছ থেকে একটা সুন্দর শ্বেত পাথরের থালা কিনেছিলাম লক্ষ্মী পুজোয় জন্য । আরও কয়েকটা কেনার ইচ্ছে থাকলেও ওজনে কুলোবে না বলে কিনতে পারিনি । যথারীতি বাঙালি মেয়ে পুজো দিতে যাচ্ছি তাই লাল পাড় শাড়ি পড়েছিলাম । পুজোর পর মন্দিরের পুরোহিত আমাদের কপালে বড় লাল সিঁদুরের ফোঁটা পরিয়ে দিয়েছিল আর তাতে আমাকে বোধহয় মাতাজি মাতাজি লাগছিল । কারণ তার পর থেকেই পঁচিশ ছাব্বিশ বছরের ড্রাইভার নীপেন চলে আসার দিন অব্দি আমাকে মাতাজি বলে ডাকতো ।

এরপর আমরা নীপেনের মাতাজি আর স্যারের জন্য ভাড়া করা 'প্রাইভেট' নৌকো করে গিয়েছিলাম ব্রহ্মপুত্র নদীর মাঝখানে পিকক্ দ্বীপে বা ময়ূর দ্বীপে শিবের উমানন্দ মন্দির দেখতে । ১৬৯৪ সালে রাজা গদাধর সিংহ তৈরী করেছিলেন এই মন্দির । অবশ্য ১৮৯৭ সালে ভুমিকম্পে আসল মন্দির ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর স্থানীয় এক ধনি ব্যবসায়ী আবার নতুন করে মন্দিরটা তৈরী করেন । হিন্দু শাস্ত্র মতে শিব তার স্ত্রী পার্বতীর সুখ স্বাচ্ছন্দের জন্য এই দ্বীপ সৃষ্টি করেন । জনপ্রচলিত বিশ্বাস শিব এখানে ভয়ানন্দ রূপে বিরাজমান । কালিকা পুরাণের এক আখ্যান মতে সতীর মৃত্যুর পর শিব যখন ঘোর তপস্যায় নিমগ্ন ছিলেন তখন কামদেব তপস্যা ভেঙ্গে দেওয়ায় ক্রোধিত শিব তাঁর ত্রিনয়নের দ্বারা কামদেবকে এখানে ভস্ম করেন । এর জন্য এর অন্য নাম হচ্ছে ভস্মাঞ্চল । উমানন্দ মন্দিরে মহাশিবরাত্রি খুব ঘটা করে পালন করা হয় । শিবরাত্রির জন্য উমানন্দ দ্বীপে আর ব্রহ্মপুত্রের তীরে মেলা বসে । সেদিন দূর দূরান্ত থেকে ভক্তরা পুজো দিতে আসে । ওখনকার বিশ্বাস সোমবার অমাবস্যার দিন হলো সবথেকে ভালো পুজোর দিন ।

'প্রাইভেট' নৌকোর অবস্থা যাইহোক ব্রহ্মপুত্র নদীর উপর দিয়ে যেতে খুব ভালো লেগেছিল । মনে মনে ভাবছিলাম কত গান কত গল্প শোনা এই সেই ব্রহ্মপুত্র নদী । নৌকো থেকে নেমে চারদিকে তরতাজা হনুমান ঘুরতে দেখে ছবি তোলার লোভ আর সামলাতে পারিনি । নীপেন বলেছিল মাতাজি আগে মন্দির প্রদক্ষিণ করো তারপর আমি তোমাদের ভালো ভালো হনুমান দেখাব । ভালো ভালো হনুমান মানে কি বুঝতে না পারলেও নীপেন যে স্যার আর মাতাজি বানর-হনুমান প্রেমিক ধরে নিয়েছে তা বুঝতে পেরেছিলাম । কারণ কামাখ্যা মন্দির থেকে বের হয়ে গাড়িতে ওঠার আগে নীপেন স্যারকে বানরের ছবি তুলতে দেখে রাস্তায় এক জায়গায় গাড়ি থামিয়ে গাছের ওপর আমাদের অনেক বানর দেখিয়েছিল ।

উমানন্দ মন্দিরের সবথেকে বড় উৎসব শিব চতুর্দশীর পরের দিন ছিল সেটা । যদিও আগের দিনের ওই বড় উৎসবের চিহ্ন কিছু কিছু ছিল চারপাশে তবু বেশ পরিস্কার পরিচ্ছন্ন পরিবেশ । চারদিকে জল আর মাঝখানে এই মন্দির । মন্দিরের চাতাল থেকে ব্রহ্মপুত্র নদী দেখে মন ভরে গিয়েছিল । তাছাড়া

ময়ূর দ্বীপ, এই মিষ্টি নামটা শুনেই এক রোমান্টিক ভালো লাগায় মন খুশি হয়ে উঠেছিল। দ্বীপটির আকৃতির জন্য ব্রিটিশরা এই দ্বীপটিকে পিকক্ দ্বীপ বা ময়ূর দ্বীপ নামে নামকরণ করেছিল। এটাকে পৃথিবীর ক্ষুদ্রতম নদী দ্বীপ বলা হয়।

মন্দির দেখে বের হওয়ার পর নীপেন আমাদের চায়ের দোকানে নিয়ে গিয়ে নিমকি কিনতে বলাতে খুব অবাক হয়েছিলাম। নৌকো থেকে নামার পর ছোট্ট দোকানটা চোখে পড়েছিল। যাইহোক নিমকি কেনার পর দেখে মনে হচ্ছিল নিমকিগুলি বেশ সুস্বাদু। একটা কামড় দেবো কিনা ভেবে ভয়ে ভয়ে নীপেনের স্যারের দিকে সবে তাকিয়েছি (কারণ স্যারের আবার বাইরে যেখান সেখান হতে খাবার কিনে খাওয়া একদম পছন্দ না) হঠাৎ দেখি একটা লোমোশ হাত আমার সামনে। ভয় পেয়ে দু-পা পিছেয়ে যেতেই নীপেন বলেছিল, ভয় নেই মাতাজি খুব ভদ্র ওরা। এরা সব চা-ওলার হনুমান। দাও মাতাজি একটা নিমিকি দাও অক্ষয় কুমারকে। তারপরেই চেঁচীয়ে উঠেছিল, স্যার স্যার মাতাজির ছবি তুলুন অক্ষয় কুমারের সাথে। বুঝলাম আমার সামনে বলিয়ুডের অক্ষয় কুমার দাঁড়িয়ে আছেন নিমকির জন্য। আর অক্ষয় কুমারকে নিমকি দেওয়ার ছবি তোলার সুযোগ হারালে আমার গৌহাটি ভ্রমনটাই বৃথা। যাইহোক, একটা নিমকি দিতেই ভদ্র অক্ষয় কুমার চলে গেলেন। আর চা-ওলা সাথে সাথে হেমা - - -, হেমামালিনি বলে ডাকতেই তর তর করে গাছ হতে নেমে হেমা মালিনির আবির্ভাব আমার সামনে। কি আর করি ওকেও নিমকি দিলাম। তারপর মিনা কুমারী, শ্রীদেবী, জয়া প্রদা সব একের পর এক এসে নিমকি নিয়ে গেল। সত্যিই ভদ্র ওরা একটার বেশী দুটোর জন্য বায়না করে না। শেষ নিমকিটা আছে হাতে ভাবলাম এটা নিশ্চই মাতাজির জন্য। ও হরি, নীপেন বলে কিনা, মাতাজি একটু কষ্ট করে সামনের ওই গাছটায় বসে থাকা প্রিয়াঙ্কা চোপড়াকে নিমকিটা দিয়ে এসো। ও খুব অহংকারী। কাছে গিয়ে না দিলে নিমকি নিতে নিজে কখনো আসবে না। ওকে গিয়ে দিয়ে আসতে হয়। তা অহংকার তো হবেই ও যে শুধু বলিউড না একেবারে খোদ হলিউডের আর্টিস্ট। না দুঃখ করার কিছু নেই। নিমকি নাই বা পেলাম খেতে কিন্তু বলিউড আর হলিউডের সব তাবড় তাবড় আর্টিষ্টদের সাথে তো ছবি তুলতে পেরেছিলাম।

এরপর নীপেনের খুব উৎসাহ মাতাজি আর স্যারকে গৌহাটি শহরটা দেখাবার। উমানন্দ মন্দিরের পর ও আমাদের নিয়ে গিয়েছিল পানবাজারে। ওখানে গিয়ে বুঝতে পেরেছিলাম কেন গৌহাটিকে নোংরা শহর বলে। নীপেনের খুব ইচ্ছে ছিল আমাদের পানবাজার, পল্টনবাজার ইত্যাদি সব বাজার দেখাবার। কিন্তু সাইকেল, রিকশ, গাড়ির যানজট আর তার উপর চারদিকের জঞ্জালে ভর্তি পানবাজারের অবস্থা দেখে আর দেরী না করে সোজা চলে গেলাম শংকরদেব কলাক্ষেত্র।

৯০দশকে প্রতিষ্ঠিত এই সংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানটির নাম মধ্যযুগের কবি-নাট্যকার ও সমাজ সংস্কারক শ্রীমন্ত শংকরদেবের নামে রাখা হয়েছে। মিউজিয়াম, প্রদর্শনী কেন্দ্র, সাহিত্য অ্যাকাডেমি, মুক্তাঙ্গন থিয়েটার ইত্যাদি সহ বিশাল এলাকা নিয়ে এই কলাক্ষেত্রটি অবস্থিত। আমাদের ড্রাইভার কাম গাইড নীপেনের কাছে শুনেছি প্রতিদিন ওখানে ভারতবর্ষের সব বড় বড় শহর থেকে গানের সব বিখ্যাত গুণীজন আসেন গান গাইতে। খুব উৎসাহ নিয়ে আমাদের ওখানে নিয়ে গিয়ে মুচড়ে পড়া নীপেনের মুখ দেখে আমাদেরও মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল। কারণ মাতাজিকে কোথায় বলিউড/টলিউডের বিখ্যাত গায়কদের গান শোনাবে তা না সেদিন একদল বিহারী বসে ঢোল বাজিয়ে রামা হৈঁ রামা হৈঁ করে কাওয়ালি গেয়ে যাচ্ছে। অবশ্য জনিনা ওটা কাওয়ালি-ই ছিল কিনা। নীপেনের মাতাজিরও তো জ্ঞানের ভান্ডার দেখতে হবে। তবে ওখানে অনুপমের ছবি ছিল। কিছুদিন আগে ও কলকাতা থেকে গাইতে এসেছিলেন। আমাদের পৌঁছুতে দেরী হয়েছিল বলে বেশী কিছু দেখার সময় পাইনি কলাক্ষেত্রে।

এরপর আমরা গিয়েছিলাম পাহাড়ের পাদদেশে বশিষ্ঠ মুনির আশ্রমে। তখন সন্ধ্যা হয়ে আসছে। আশ্রমে ঢুকতেই অভিনন্দন জানাল আশ্রমে থাকা এক ঝাঁক বানরের দল। না ওদের গল্প করে আপনাদের আর বিরক্ত করবো না। আশ্রমের ভিতরে মন্দিরে ঢুকে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে বশিষ্ঠ মুনি যে ঘরে ধ্যান করতেন সেই ঘরে যেতে হয়। ঘরটা এমনিতেই অন্ধকার তার ওপর তখন সন্ধ্যা হয়ে এসেছে তাই ভালো করে কিছু দেখা যাচ্ছিল না। মোমবাতির আলোয় যতটুকু দেখা যায়। একজন পুরোহিত তখন পুজো করছিলেন। মন্দিরের মধ্যে বশিষ্ঠ মুনির পদচিহ্ন আছে শুনেছি তবে আমাদের দেখার সৌভাগ্য হয়নি। আশ্রমের ঠিক পেছনের পাহাড় থেকে বয়ে আসা একটা প্রকৃতিক ঝর্ণা আছে। আশ্রমে

আসা অনেক দর্শনাথী এই ঝর্ণায় স্নান করে সুচীশুদ্ধ হোন। বলা হয়ে থাকে এই ঝর্ণার জল স্পর্শ করে মাথায় দিলে মনের সব দুঃখ কষ্ট দূর হয়ে যায়। সেদিন ঝর্ণার মধ্যে থাকা একটা পাথরে বসে জলের শব্দ শুনতে শুনতে অপূর্ব এক দিনের বিদায় নেওয়া দেখেছিলাম। আগামীকাল ফিরে যেতে হবে ভেবে মন ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছিল। নীপেন বলেছিল স্যার মাতাজির সাথে আমার একটা ছবি তুলে দেবেন। বাঁধিয়ে ঘরে রেখে দেব। ও বার বার আমাদের আরও একটা দিন থেকে যাওয়ার জন্য আন্তরিক ভাবে অনুরোধ করেছিল। বলেছিল, অনেকদিন পর একটা ভালো দিন কেটেছে ওর। মাতাজিকে আমার নিজের মা মনে হচ্ছে। আমারও মনে হচ্ছিল আরও একটা দিন থেকে গেলে ভালো হতো। কিন্তু উপায় নেই। চার দিন পরেই আমাদের শিকাগো ফেরার ফ্লাইট ছিল কলকাতা থেকে।

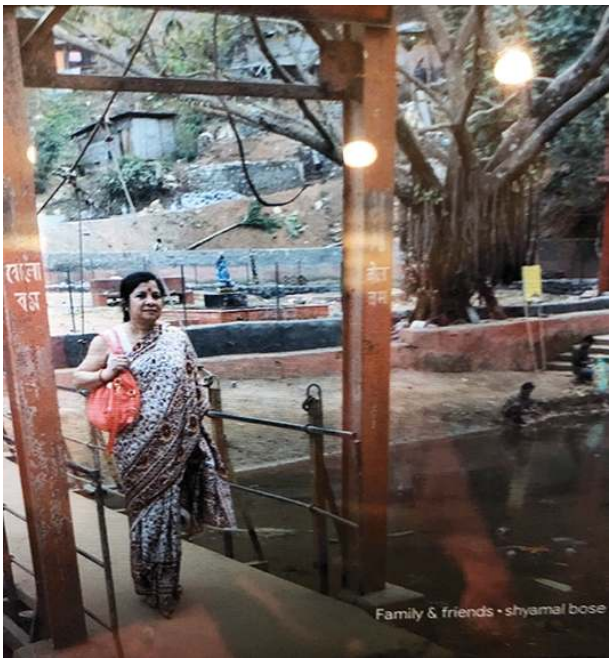

পরের দিন সকালে নীপেন এসেছিল আমাদের এয়ারপোর্ট নিয়ে যেতে। আমাদের থেকেও বেশী মন খারাপ হয়েছিল ওর। বার বার বলছিল চলুন না স্যার আমি গাড়ি করে আপনাদের কলকাতা নিয়ে যাবো। মাতাজি, একটু বলুন না স্যারকে। ওকে সান্তনা দিয়ে বলেছিলাম আবার আসব আমরা নীপেন। এয়ারপোর্টে নামার পর ওর হাতে কিছু টাকা দেওয়ার সময় ওর চোখে জল দেখেছিলাম। জানিনা কি চোখে আমাকে ও দেখে ছিল। কেন ওর আমাকে ওর মায়ের মতো মনে হয়েছিল। এখনো মাঝে মাঝে মনে পড়ে নীপেনের কথা। ভাবি হয়তো নিজের মা নেই ওর, কি জানি হয়তো মাকে ও হারিয়েছে ছোটবেলায়। বলেছিল ছোট্ট এক গ্রাম থেকে ও এসেছে গৌহাটি শহরে রুজি রোজগারের জন্য। মনে হয় ওর জন্যই আমাদের গৌহাটি সফর এত মনোরম হয়েছিল। দরজা দিয়ে এয়ারপোর্টে ঢুকে যাওয়ার আগে শেষবারের মতো ফিরে তাকিয়া দাঁড়িয়ে থাকা নীপেনের বিষণ্ন মুখ দেখে মনে পড়েছিল কবিগুরুর লেখা আমার প্রিয় একটা কবিতার কয়েকটা লাইন —

সব চেয়ে পুরাতন কথা, সব চেয়ে
গভীর ক্রন্দন 'যেতে নাহি দিব'। হায়,
তবু যেতে দিতে হয়, তবু চলে যায়।

না তারপর আমাদের আর যাওয়া হয়নি গৌহাটি। তবে নীপেনের স্যার ওকে মাতাজির সাথে তোলা ওর ছবি পাঠিয়ে দিয়েছিল ওর দেওয়া গ্রামের ঠিকানায়।

মনীষা বসু — জন্ম কলকাতায়। সত্তর দশকে বিয়ের পর থেকে শিকাগোবাসী। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক। Purdue University থেকে কম্পিউটার সাইন্সে বি এস ডিগ্রি। পেশায় আই. টি.। ছোটবেলার থেকেই লেখালেখির অভ্যাস। আমেরিকার বিভিন্ন বাংলা পত্র পত্রিকায় গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। প্রিয় অবসর — বই পড়া, গান শোনা, লেখা আর বাগান করা।

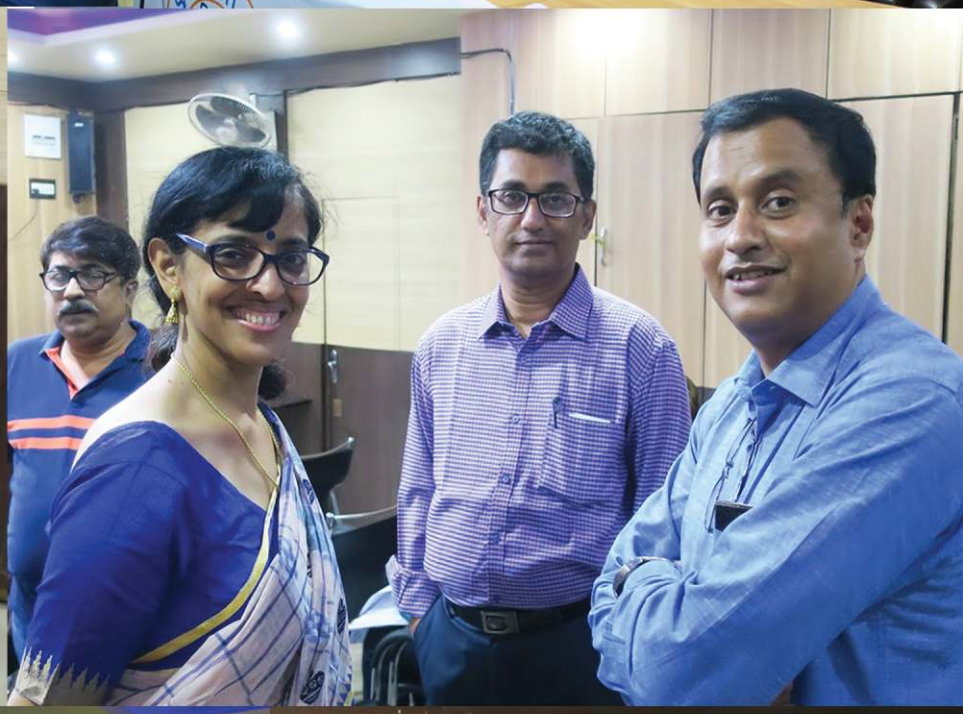

Andrew Ford, the Consul General of Australia, Tridib Chatterjee, the President – Publishers and Book Sellers Guild with Team Batayan and guests

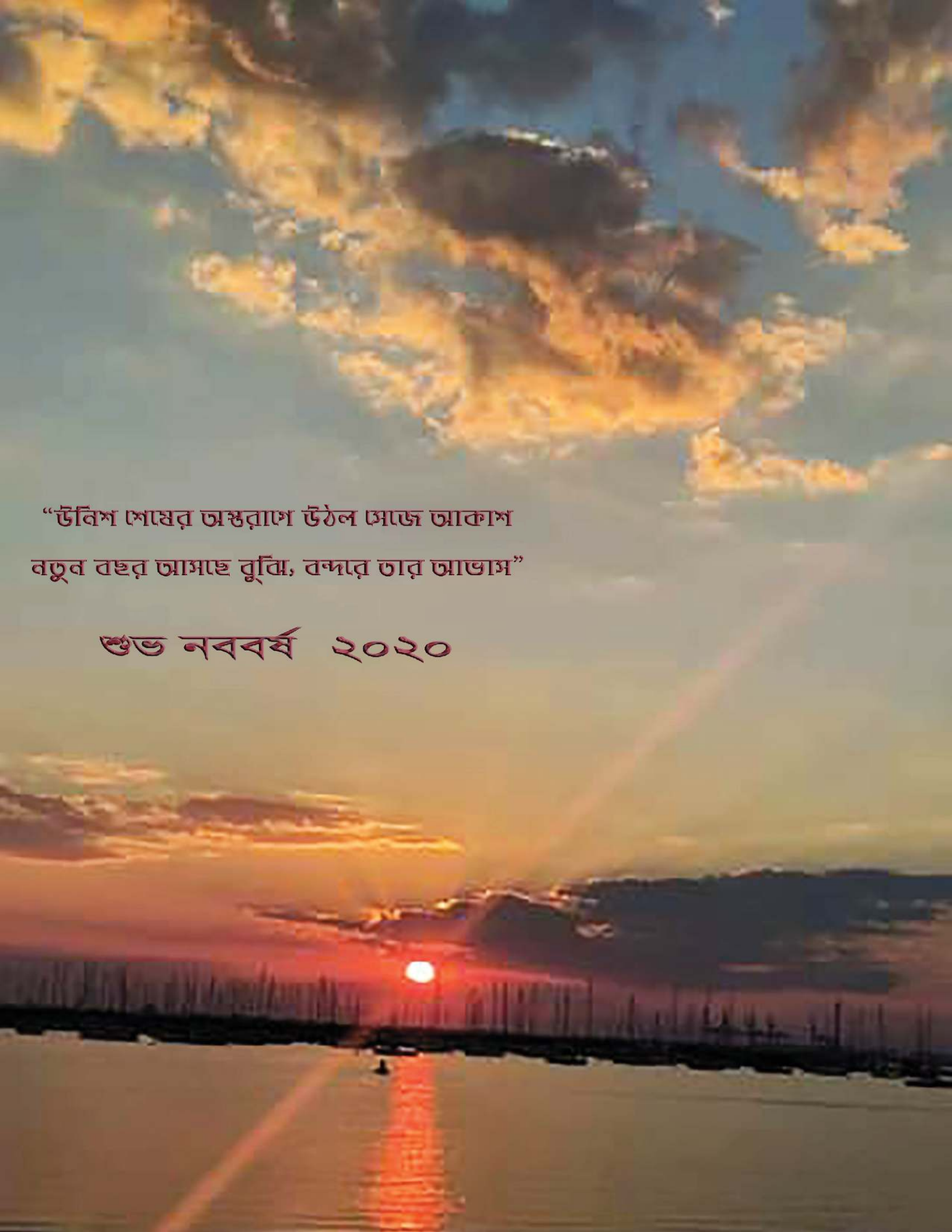
"উনিশ শেষের অস্তরাগে উঠল সেজে আকাশ
নতুন বছর আসছে বুঝি, বন্দরে তার আভাস"
শুভ নববর্ষ ২০২০